

ইতিহাস যুগে যুগে







অভিনব প্রকাশন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৮০ শিক্ষাবর্ষ হইতে ত্রিপুরা ও
পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের
ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত,
[Vide Notification No. T. B. VI/H/79/106, Dated 5.12.79]

ইতিহাস যুগে যুগে

প্রাচীন যুগ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীদীপ্তি প্রকাশ মণ্ডল, বি. এ., বি. টি., সার্ট-ইন. থিও.
ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক
স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
কলিকাতা

অভিনব প্রকাশন
৩০এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
সরস্বতী সাউ
৩০এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৭৯
সংশোধিত প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৯
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮০

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র।

মুদ্রক ঃ
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

সামনের বছর নিয়ে আসছে ইতিহাসের নতুন পাঠ্যসূচী—ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকের উদ্বেগের কারণ হয়ে। নতুন এক বিন্যাসে সজ্জিত হতে চলেছে ইতিহাসের এই নতুন পাঠক্রম। ফলে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার উপর অর্পিত হয়েছে এক গুরু দায়িত্ব। ষষ্ঠ শ্রেণীর এই নতুন বইটি নতুন পাঠ্যসূচী নিয়ে আসছে। এর জন্য চাই প্রাঞ্জল ভাষা, আকর্ষণীয় উপস্থাপনা, চাই শৃঙ্খলাসম্মত পারম্পরিক অধ্যায়।

দীর্ঘ বছর ধরে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস শিক্ষার সমস্যাগুলির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। এই দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্পর্শে এসে জেনেছি পঠন-পাঠনে কোথায় তাদের বিপত্তি ঘটে,—তাদের ধারণাশক্তি কোথায় বাধা পায়, ঠিক কোনখানে সংক্ষেপ করা দরকার আবার কোথায় বিশদ বিবরণের প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উপলব্ধির জন্য।

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকসমাজের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিবেদন করার জন্যই আমার এই মুখবন্ধ। ভাষার সাবলীল ভঙ্গী—চিন্তার স্বচ্ছতা—বাহুল্য বর্জন অথচ সারবস্তুর বিশদ বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্রের সহযোগে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল আমার পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ও অধ্যায়গুলি যেসব স্তরে বিভক্ত সেগুলির শেষে অনুশীলনী যোজনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করেছি তার বিচারের ভার অর্পণ করি বরেণ্য শিক্ষকসমাজের উপর। এ বই যাদের উদ্দেশ্যে লেখা—তাদের কাজে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

কলিকাতা
১২ জুন, ১৯৭৯

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

SYLLABUS : HISTORY—CLASS-VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS :

A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development).

(ii) How we come to know of ancient people.

B. *Early man* : Use of fire as early as 300,000 B.C. (by 'Peking Man') : Food gathering man.

Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses.

New Stone Age : (By 8000 B.C.) :

Evolution of tools and implements. Man—a food producer. *The Neo-lithic revolution* consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. *Copper-Bronze Age* : Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.

D. *The Early Civilisations* (3000 B.C.—1500 B.C.)—

Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :

(i) *Mesopotamia* : (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (b) Fertility of the soil,—crops. (c) Defence against floods. (d) Other occupations. (e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) *Egypt* : (a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (examjles) ; (e) Religious beliefs (f) Chief occupations.

(iii) *The Indus Valley* : (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv *China* : (a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. *The Iron Age-Societies* : (a) Discovery and use of iron, its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth of Kingship.

I. (i) *Babylon* : Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and culture ; The Code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code.

(ii) *Egypt as an Imperial power* : Colonies ; The power of priests.

(iii) *Iran* : Rise of Persia ; Zoroaster.

(iv) *The Jews* : Hebrews in Egypt ; Hebrew oxodus under Moses—flight from slavery.

II. *Greece* (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta their social and political life. Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles. Socretes, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. *Rome* : Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Particians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus).

Julius Caesar : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. *China* : "Great Shang". Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. *India* : (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion, and political oranisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Maur yas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien.—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outline only). (j) A brief summary of ancient India developments in arts and architecture, literature education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

F. *From the Ancient To The Mediaeval Era.*

How the Ancient world opened the gates to the Mediaeval world. (a) Gradual changes in productive relationships. (b) Slave revolts. (c) Limitations to citizenship and human rights—toilers and producers were mere personal effects. (d) Growth and decline of Empires. (e) Rise of lesser potentates. (f) Emergence of feudal economic relations.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন

- আমরা ইতিহাস কেন পড়ব
- আগের দিনের কথা কিভাবে জানা যায়

আমরা ইতিহাস কেন পড়ব

ইতিহাস কি, সাধারণভাবে আমরা সবাই তা জানি। প্রাচীন কালে যা ঘটেছে, সেই কাহিনী হল ইতিহাস। আগে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী নিয়ে ইতিহাস রচিত হত। ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ কিন্তু রাজরাজড়াদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী কেবল নয়। তবে ইতিহাসে এসব ঘটনাও থাকে।

ইতিহাস কথার আসল অর্থ হল মানুষের কথা। আদিমকাল থেকে মানুষ কিভাবে তার সমাজ ও জীবনযাত্রা উন্নত করেছে, ইতিহাস হল মানুষের সেই উন্নতির কাহিনী, অগ্রগতির কাহিনী।

যে উন্নত সমাজ ও জীবনযাত্রার মধ্যে এখনকার মানুষ বাস করছে তা গড়ে উঠেছে বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ তার সামাজিক জীবনকে উন্নত করতে পেরেছে। অগ্রগতির এই ধারা এখনও চলছে অবাধ গতিতে। বর্তমান মানুষ তাই প্রাচীন মানুষের উত্তরপুরুষ।

ইতিহাস না পড়লে আমরা প্রাচীন যুগের মানুষদের কথা জানতে পারি না। ইতিহাস পড়ে আমরা জানি মানুষের এই সভ্যতা কি করে গড়ে উঠেছে। কি ধরনের দুঃখ-কষ্ট-সংগ্রাম আগের কালের মানুষদের করতে হয়েছিল, তারই কাহিনী হল ইতিহাস। তাই সেইসব কাহিনী জানার জন্য আমাদের ইতিহাস পড়া দরকার।

আগের কালের মানুষ সভ্যতার পথে যে অবদান রেখে গেছে আমাদের কাজ তাকে আরও উন্নত করে, পরিপূর্ণ করে, আমাদের পরে যারা আসবে তাদের জন্য রেখে যাওয়া। ইতিহাস ভাল জানা থাকলে এই কাজ করা সহজ হবে। সভ্যতার অগ্রগতির সঠিক নির্দেশ দিতে পারে ইতিহাস। তাই ইতিহাস পড়া একান্ত প্রয়োজন।

ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনা গল্প-উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর। তা জানায়ও আনন্দ আছে। সুলিখিত ইতিহাস সাহিত্যের সম্পদ। ভাল সাহিত্য পাঠের জন্যও ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।

আগের দিনের কথা কিভাবে জানা যায়

কোন কিছু জানার সব চাইতে ভাল উপায় হল সেই জিনিস দেখা অথবা সেই সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পড়া। অতীত কালের লোকদের কেউ দেখে নি। তারা নিজেরাও কিছু লিখে রেখে যায় নি, যা পড়ে আমরা এখন তাদের কথা সব জানতে পারি। লিখতে তারা তখন জানত না। লেখা তখন আবিষ্কারও হয় নি। তবুও তাদের সময়ের কথা জানার উপায় কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরা বের করেছেন।

যে সময়ের কোন লেখা বিবরণ নেই, ইতিহাসের সেই সময়কে বলা হয় প্রাক্-ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক কাল। যে কালের কথা লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় তা হল ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের কাল। এই সময়ের কথা জানা সহজ—বইপত্র পড়েই তা জানা যায়। কিন্তু না-জানা কালের কথা বের করা বেশ কঠিন। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁরা প্রাচীনকালের জিনিসপত্র দেখে কোন্‌টা কোন্ সময়ের, কার বয়স কত, কি রকম মানুষ তা ব্যবহার করত—এই সব কথা বলে দিতে পারেন। একটা ভাঙা দাঁত, কি ছোট এক টুকরো গলার হাড় দেখে তাঁরা মানুষটার পুরো চেহারা বলে দেন।

একজন মানুষ আর কতদিন বাঁচে? ষাট-সত্তর-আশি, কি বড় জোর একশ বছর তার বেশি নয়। মানুষ মরণশীল। তবু জাতি হিসেবে মানুষ অমর। জাতি হিসেবে মানুষ বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকতে হলে প্রত্যেক মানুষের কোন-না-কোন জিনিসের প্রয়োজন হয়। মরার সময় মানুষ সে সব জিনিস নিয়ে যায় না, তা পড়ে থাকে। এই রকম বহু গোষ্ঠীর বহু মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র একসময় মাটি চাপা পড়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর নানা জায়গার মাটি খুঁড়ে এই সমস্ত জিনিস বের করেছেন এবং এখনও করছেন। প্রাচীন কালের মানুষের ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র বা চিহ্ন মাটির নিচে পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিসপত্র থেকে আমরা তখনকার দিনের মানুষের জীবনযাপনের প্রণালী কি রকম ছিল, কি কি জিনিস তারা ব্যবহার করত, তার অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। পৃথিবীর নানা জায়গা খুঁড়ে প্রাচীন-সভ্যতার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। হয়ত মাটির নিচে কোন বড় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। এই ধ্বংস-স্তূপ থেকে তখনকার ঘরবাড়ি কেমন ছিল, কি দিয়ে সেইসব ঘরবাড়ি তৈরি হত, কিংবা সেখানকার মানুষদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি কেমন ছিল ইত্যাদি নানা কথা জানতে পারি। মাটি খুঁড়ে পণ্ডিতরা পুরনো দিনের নানা অলঙ্কার,

অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, পাথরে খোদাই করা বহু মূর্তি পেয়েছেন। পাথরের সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে ধাতুর তৈরী নানা জিনিসপত্রও অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। প্রাচীন মানুষ অনেক সময় রঙ দিয়ে গুহার গায়ে পাথরের উপর পশুপাখির ছবি ইত্যাদি আঁকত। সেই সমস্ত ছবিও খুঁজে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া অনেক জায়গায় পুরনো দিনের কবর খুঁড়ে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য নানা প্রকার জিনিসপত্রও আবিষ্কার করা হয়েছে। প্রাচীন কালে অনেক দেশে মৃত ব্যক্তির কবরে তার ব্যবহার করা ঐ সব জিনিসপত্র দেওয়ার নিয়ম ছিল।



প্রাচীন যুগের মাটির পাত্র

প্রাচীন কালের এই সব নিদর্শন, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শহরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি দেখে আমরা পুরনো দিনের ইতিহাস জানতে পারি। পণ্ডিতরা এই সব জিনিসপত্রের বয়স কত হতে পারে তারও হিসাব বের করেছেন। লিখতে শিখে প্রাচীন কালের মানুষ গুহার গায়ে, পাথরের স্তূপে বা স্তম্ভের গায়ে নিজেদের ভাষায় অনেক কথা লিখে রেখে গেছে। তাদের সেই লেখা সকলেই পড়তে পারে না। কেবল কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পারেন। এই লেখা থেকে তাদের কথা, তাদের আমলের অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। এছাড়া প্রাচীন কালের কাহিনী-উপকথা, রামায়ণ, মহাভারত থেকেও কিছু কিছু জানা যায়।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ইতিহাস কাকে বলে ? ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ?
২। কেমন করে আমরা অতীত মানুষের কথা জেনেছি ?
৩। ঐতিহাসিক যুগ ও প্রাক্-ঐতিহাসক যুগ বলতে কি বোঝ ?
৪। ধ্বংসস্তূপ থেকে আমরা কিভাবে প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানতে পারি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) ইতিহাস কথাটির অর্থ কি ? (২) ইতিহাস পাঠে কি জানা যাবে ? (৩) আমরা ইতিহাস পাঠ করে উপকৃত হব কেন ? (৪) ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয় কবে থেকে ? (৫) প্রত্নতাত্ত্বিক কাদের বলা হয় ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। 'ক' স্তম্ভের বক্তব্যের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের কথাগুলি মিলিয়ে লেখ ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(ক) 'ইতিহাস' কথার আসল অর্থ	(ক) শিলালিপি
(খ) বর্তমান মানুষ প্রাচীন মানুষের	(খ) মাটি খুঁড়ে
(গ) লিখিত ইতিহাসের আগের যুগ	(গ) মানুষের কথা
(ঘ) প্রাচীন ইতিহাস জানার একটি উপাদান	(ঘ) উত্তর পুরুষ
(ঙ) প্রাচীনকালের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে	(ঙ) প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ

২। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) ইতিহাস কথার আসল অর্থ হ'ল — কথা।
(খ) বর্তমান মানুষ প্রাচীন মানুষের — পুরুষ।
(গ) যে কালের কথা লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, তা হল — কাল।
(ঘ) বর্ধমান জেলার — নামক স্থানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
(ঙ) ইতিহাস পাঠ করে আমরা — কথা জানতে পারি।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(১) ঐতিহাসিক যুগ কাকে বলে ?
(২) দু'চারটি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের উদাহরণ দাও।
(৩) প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে মানুষ কি লিখতে জানত ?
(৪) প্রাচীন যুগের ভারতের বিবরণ আছে এমন একটি পুস্তকের নাম লেখ।
(৫) কারা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায়
আদি মানব

- আদি মানব
- প্রাচীন প্রস্তর যুগ
- নতুন প্রস্তর যুগ
- নতুন প্রস্তরযুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন

আদি মানব

মানুষের উৎপত্তি ঃ পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে জন্ম নিল তার সঠিক উত্তর এখনো পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। কতকগুলো অনুমানের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকরা মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করেছেন। যে মত এখন প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন তা হল বিবর্তনবাদ। বিবর্তন অর্থাৎ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে মানুষ মানুষ হয়েছে। এই মত যিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর নাম চারল্স ডারউইন। এই মত অনুসারে স্তন্যপায়ী বানর-জাতীয় এক রকম প্রাণীর একটি শাখা থেকে একদিন মানুষের উৎপত্তি হয়।

জাভা মানব ঃ প্রথম মানুষ কোথায় ছিল সে সম্বন্ধেও নানা মত আছে। এত দিন পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল এশিয়া মহাদেশের জাভা দ্বীপে প্রথম মানুষ ছিল। কিন্তু এখন আবিষ্কার করা হয়েছে জাভা-মানুষের চাইতেও প্রাচীন মানুষের কঙ্কালের অস্তিত্ব আছে আফরিকার টাঙ্গানিকায়। জাভায় পাওয়া কঙ্কালের বয়স পাঁচ লক্ষ বছর। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ ছিল। জাভা-মানুষ সাড়ে পাঁচ ফুটের মত (প্রায় ১৬৮ সে. মি.) উঁচু ছিল। সে সোজা হয়ে টান হয়ে হাঁটতে পারত না, হাঁটত সামনের দিকে ঝুঁকে। তার কোন ভাষাও ছিল না। তবে সে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল।



পিকিং মানব

পিকিং মানব ঃ প্রথম আগুনের ব্যবহার ঃ জাভা মানুষের পরের প্রাচীনতম মানুষ হল পিকিং মানব। এই মানুষের কঙ্কাল মিলেছে চীনের রাজধানী পিকিং (বর্তমান নাম বেজিং) শহরের কাছে এক পাহাড়ের গুহায়। গুহার নাম চো-কো-তিয়ান। পিকিং মানুষদের বয়স হিসাব করা হয়েছে তিন লক্ষ বছর। অর্থাৎ এরা জাভা মানুষের চাইতে দু'লক্ষ বছরের ছোট। জাভা মানব আর পিকিং মানবের মধ্যে দু'লক্ষ বছরের ব্যবধানে মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তাদের বুদ্ধি বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বেশি হয়েছে। সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে শিখেছে। আগের মানুষ দল বেঁধে বনে-জঙ্গলে বাস করত। পশুপাখি মেরে কাঁচা মাংস খেত। খোলা জায়গায় বা গাছের উপর বাস করত। পিকিং মানবরা কিন্তু বাস করত গুহায়। গুহায় বাস করে তারা জলবৃষ্টির হাত থেকে, শীতের হাত থেকে বাঁচার উপায় জেনেছিল। আগুন জ্বালার কৌশলও তারা বের করেছিল। আগুন জ্বালতে শিখে তারা আর আগের কালের মানুষের মত কাঁচা মাংস খেত না। মাংস পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে খেত। যে গুহায় পিকিং মানবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সেখানে আগুন জ্বালার চিহ্ন এবং পশুর পোড়া হাড়ও পাওয়া গেছে। আগুন জ্বালাবার কৌশল বের করে পিকিং মানব সভ্যতার পথে মানুষকে অনেক হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে এল।

অন্যান্য আদি মানব ঃ জাভা এবং পিকিং বাদে আরও অনেক জায়গায় প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে জারমানীর হিডেল-বার্গ মানব, ইংলণ্ডের পিলটডাউন মানব, জারমানীর নিনডারথাল মানব, ফ্রান্স

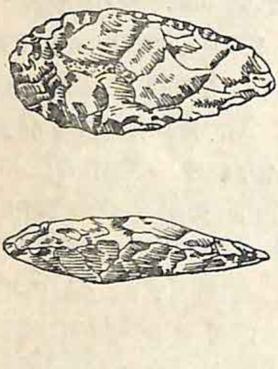
ও স্পেনের ক্রোম্যাগনন মানব প্রভৃতি। ক্রোম্যাগনন মানবরা অনেকাংশে আধুনিক মানুষের মত ছিল। তারা সোজা টান হয়ে হাঁটত। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ভাল ছিল। সব চাইতে বড় কথা তারা ছবি আঁকত। তাদের আঁকা অনেক পশুপাখির ছবি ফ্রান্স ও উত্তর স্পেনের অন্ধকার গুহায় এখনও আছে। স্পেনের আলতামিরা পর্বত গুহা প্রাচীন মানুষের আঁকা ছবির জন্য বিখ্যাত।

খাদ্যসন্ধানী আদি মানব ঃ আদি মানবরা কিন্তু নিজের খাবার নিজেরা উৎপাদন করতে জানত না। তারা খেত বনজঙ্গলের ফলমূল বা জঙ্গলের শিকার করা পশুর মাংস। পশু নিজেরা শিকার করত কিংবা অন্য পশুর দ্বারা মৃত পশুর মাংস খেত। এক জায়গার খাবার শেষ হয়ে গেলে, কিংবা অভাব দেখা দিলে তারা চলত নতুন জায়গার খোঁজে, যেখানে প্রচুর খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তাই আদি মানবরা ছিল খাদ্যসন্ধানী যাযাবর। খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা ছিল তাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ।

পুরাতন প্রস্তর যুগ

যে কালে মানুষরা কেবল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত সেই যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগ দুই ভাগে বিভক্ত—পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষরা আগুন জ্বালাতে শিখে মাংস পুড়িয়ে বা ঝলসিয়ে খেত। পশু শিকারের জন্য তারা অস্ত্র তৈরি করত পাথর দিয়ে। পশু শিকারের পর সেই পশুর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তারা তাই নিজেদের পরনের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করত। কোন ধাতুর ব্যবহার তারা জানত না। তাদের চারদিকে ছিল প্রচুর পাথর। এই পাথর তারা ব্যবহার করতে থাকে শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য। পুরাতন প্রস্তর যুগের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র একটুও ভাল ছিল না। এগুলি সাদামাটা ধরনের, কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেবার মত। এগুলির ধার ছিল না, চাকচিক্য ছিল না, এগুলি ছিল ভাঙা পাথরের টুকরোর সামিল।

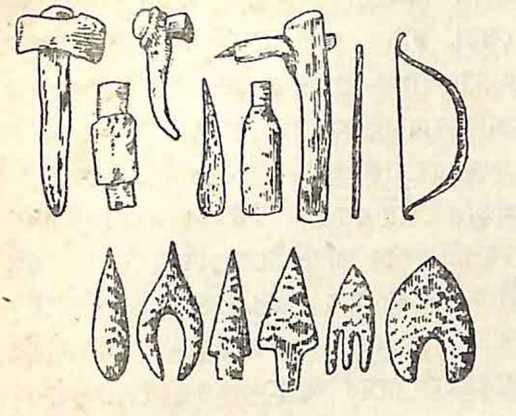
মানুষের জীবনে এইরূপ অবস্থা চলে হাজার হাজার বছর। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ফলে ক্রমে মানুষ কিছুটা উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শেখে।



পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

নতুন প্রস্তর যুগ

মানুষের কিছুটা উন্নত অবস্থার নাম ঐতিহাসিকরা রেখেছেন নতুন প্রস্তর যুগ। এই যুগের মানুষ নানা দিক দিয়ে আগের যুগের মানুষের চাইতে উন্নত ছিল। তারা অনেক নতুন জিনিস জানত যা আগের মানুষরা জানত না বা করতে পারত না। এই যুগের মানুষও পাথর দিয়েই অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করত। পরে যখন কৃষি-কাজ শিখল তখন কৃষি-কাজের জন্যও পাথরের যন্ত্রপাতি তৈরি করত। এদের তৈরি জিনিসের চাকচিক্য বেশি ছিল দেখতেও সুন্দর ছিল।



নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

কৃষিকাজ করার জন্য জমি চাষ করা দরকার। জমির মাটি খুঁড়বার জন্য তারা নানা ধরনের পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত।

খাদ্য উৎপাদন ঃ পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না। তারা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ কৃষিকাজ শিখে নিজের খাদ্য নিজে উৎপন্ন করতে শিখল। সে আর আগের মত খাদ্যসন্ধানী রইল না, হল খাদ্য উৎপাদক। খাদ্য উৎপাদন করতে শেখায় এই যুগের মানুষের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সামিল।

নতুন প্রস্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন

পশুপালন ঃ কৃষিকাজ শেখার ফলে মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর ফলে মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটে। কেননা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালে চাষবাস করা যায় না। চাষবাসের জন্য স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে হয়। কৃষিকাজ শেখার পর থেকে মানুষ কৃষিজমির ধারে কাছে ঘর বেঁধে বাস করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বন্য পশুদেরও পোষ মানাতে শেখে এবং তাদের নিজেদের কাজে লাগাতে থাকে। প্রথম যে

বন্য পশু মানুষের পোষ মানে তা হয়ত ছিল কুকুর। কুকুর খাদ্যের লোভে মানুষের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। মানুষ তার খাবারের অবশিষ্ট তাকে দিত। এইভাবে অনায়াসে খাবার পেয়ে কুকুর মানুষের পোষ মানে। মানুষ কুকুরকে দিয়ে পাহারার কাজ ও শিকার প্রভৃতি করাতে থাকে। এর পর মানুষ ক্রমে গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতি পোষ মানাল এবং নিজের কাজে লাগাল। গোরু-মোষ-ছাগল-ভেড়ার দুধ তারা পান করত এবং এদের মাংসও তারা খেত। গাধা ব্যবহার করা হত মোটঘাট বইবার জন্য।

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ কুমোরের চাকা আবিষ্কার করে মাটি দিয়ে নিত্য প্রয়োজনের ঘটিবাটি, কলসী প্রভৃতি তৈরি করত। এই সব মাটির জিনিস প্রথমে রোদে শুকনো করা হত। পরে তা ভাটিতে পুড়িয়ে নিত। এই যুগের তৈরী মাটির হাঁড়ি-কলসী অনেক জায়গায় মাটির নিচে পাওয়া গেছে। এই রকম জিনিস সম্প্রতি মেদিনীপুরে আবিষ্কার করা হয়েছে। এই যুগের মানুষ কাপড় বুনতে জানত। প্রথমে গাছের আঁশ বা তন্তু দিয়ে কাপড় তৈরি হত, পরে পশুর লোম পাকিয়ে মোটা কাপড় তৈরি করত। এই যুগের লোকেরা আগের কালের মানুষের মত পশুর চামড়া পরত না।

বাসগৃহ ঃ যানবাহন ঃ মানুষ স্থির হয়ে বসবাস করার ফলে তার বাস-গৃহের দরকার হল। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে তার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তারা ঘর তৈরি করত। প্রথম দিকে গাছের ডালপালা লতাপাতা দিয়ে ঘর ছাইত। পরে পাথর দিয়ে আচ্ছাদনের কাজ হতে থাকে। জন্তু-জানোয়ার বা শত্রু সহজে যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য ঘরের চারদিকে উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। ঘরবাড়ি তৈরির জন্য পাথর দরকার। পাথর সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যেত না, আনতে হত দূর থেকে। এই কাজে তারা নিয়োগ করত গৃহপালিত পশুদের। বলদ, গাধা প্রভৃতি পশুর পিঠের উপর পাথর চাপিয়ে বয়ে আনত। যানবাহনের জন্য পরে অনেক জায়গায় গাড়ির প্রচলন হয়।

সামাজিক জীবনের শুরু ঃ ধর্মবিশ্বাস ঃ ফসলের মাঠের ধারে-কাছে লোকে ঘর বেঁধে বসবাস করত। পাশাপাশি অনেক ঘর থাকত। কাজও প্রায় সবারই একই ধরনের ছিল। এক প্রকার কাজ করে এক সাথে থাকার ফলে তাদের মধ্যে একতা গড়ে উঠত। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিত। ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, আত্মীয়তা প্রভৃতির সৃষ্টি হত। এইভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে

বসবাস করার ফলে তাদের সমাজ জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আবার এর থেকেই সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী জীবনের। গোষ্ঠীগতভাবে থাকতে থাকতে মানুষের মনে ধর্মভাবের উৎপত্তি হয়। আদি যুগের মানুষ যে কি ধর্ম পালন করত, তা সঠিক জানা যায় নি। তবে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি থেকে তারা উপকার পেত, যেমন সূর্যের আলো, বৃষ্টি, আগুন কিংবা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি তাদের মনে ভয় সঞ্চার করত, যেমন ঝড়-তুফান, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি, সেগুলোকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তারা নানাভাবে পূজাপাঠ করত, মন্ত্রতন্ত্র পড়ত। এইভাবে ধর্মের উৎপত্তি হয়।

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের আঁকা কিছু কিছু গুহাচিত্র ফ্রানস ও স্পেনে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব চিত্রের মধ্যে পশুপাখি শিকারের চিত্র বেশি। তখনকার মানুষরা মনে করত যেসব প্রাণীকে তারা সহজে ধরতে বা শিকার



স্পেনের আলতামিরার গুহাচিত্র

করতে পারে না, তার ছবি এঁকে নিলে তাকে সহজে শিকার করা যায়। এই বিশ্বাস থেকে তারা অন্ধকার গুহায় শিকারের ছবি আঁকত।

ভাষার ব্যবহার ঃ শক্তি দেবীর পূজা ঃ জাভা মানব কথা বলতে পারত না। কবে থেকে যে মানুষ কথা বলতে শিখেছে তার কোন ইতিহাস নেই। কথা বলা শিখতে মানুষের কয়েক হাজার বছর লেগেছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। প্রথমে কথা বলতে না পারলেও মানুষ ভাবতে পারত, চিন্তা করতে পারত, জন্তুর মত মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারত। হাজার হাজার বছরের পরিবর্তনের ফলে মানুষ নানা বিষয়ে চিন্তা করতে শেখে। ক্রমে তারা একে অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে বলতে শেখে। এক সময় হয়ত আকারে-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত, পরে মুখের কথায়

তা বলতে আরম্ভ করে। এইভাবে ভাষার জন্ম হয়। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যে ভাষা তারা আবিষ্কার করে, তাদের কথাবার্তা সেই ভাষাতেই হত। এক এক গোষ্ঠীর এক এক রকম ভাব প্রকাশ করার ভঙ্গি ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হল। গোষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়েছে বলেই এখন পৃথিবীতে এত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন কালের লোকদের মধ্যে নানা রকমের বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত জমিতে ফসল উৎপাদন করার জন্য কোন বিশেষ শক্তি আছে। এই শক্তিকে খুশি রাখতে পারলে ফসল বেশি হবে। তাই তারা উৎপাদন বৃদ্ধির দেবীর কল্পনা করে তার পূজা করত। এই ভাবে শক্তি দেবীর পূজার প্রচলন প্রাচীন মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) আদি মানবের সম্পর্কে যা জান লেখ।
(খ) প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ ? এই যুগের মানুষরা কিভাবে জীবন যাপন করত ?
(গ) নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ কি কি বিষয়ে উন্নত হয়েছিল ?
(ঘ) পৃথিবীতে কোথাকার মানুষ প্রথম আগুনের ব্যবহার করেছিল ? তার প্রমাণ কি ?

২। **সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) বিবর্তনবাদ বলতে কি বোঝ ?
(খ) কোথায় কোথায় প্রাচীন মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
(গ) খাদ্যসন্ধানী মানব বলতে কি বোঝ ?
(ঘ) নতুন প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্রের নাম লেখ।
(ঙ) প্রস্তর যুগের মানুষের ঘরবাড়ি কেমন ছিল ?
(চ) প্রস্তর যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। **বন্ধনীর মধ্যে ঠিক কথাটি রেখে অপরটি কেটে দাও ঃ**

(ক) স্তন্যপায়ী (বানর জাতীয়/তিমি জাতীয়) এক রকম প্রাণীর শাখা থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়।
(খ) এশিয়া মহাদেশের (সিংহল/জাভা) দ্বীপে প্রাচীন মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
(গ) (আফরিকা/পিকিং) মানব প্রথমে আগুনের ব্যবহার শেখে।
(ঘ) প্রাচীন মানব প্রথমে ছিল (খাদ্যসন্ধানী/খাদ্য উৎপাদক)।
(ঙ) আদি মানব প্রথমে (নিরামিষ/আমিষ) খেত।

তৃতীয় অধ্যায়
তাম্র যুগ ঃ ব্রোঞ্জ যুগ

- শহরের অভ্যুদয়
- সমাজজীবনের পরিবর্তন
- নদীতীরে সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ

শহরের অভ্যুদয়

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসকে যে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথমটি হল প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের অবসানের পর আরম্ভ হয় তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ। পরে যখন লোহার আবিষ্কার হল তখন তাম্র যুগের শেষ হয়ে শুরু হল লৌহ যুগ।

প্রস্তর যুগ শেষ হতেও কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। তারপর শুরু হল তাম্র যুগ। মানুষ যখন তামার ব্যবহার করতে জানল তখন থেকে প্রস্তর যুগের শেষ। মানুষ প্রথমে কি করে তামা আবিষ্কার করল তা সঠিক কেউ বলতে পারে নি। মানুষ যেদিন তামা আবিষ্কার করল সেদিন সে নিশ্চয় লক্ষ্য করল যে পাথরের চেয়ে হালকা এক ধাতু যা আগুনে গালিয়ে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালী ও চাষের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। ফলে এক সময় সমাজে তামার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হল। তামার সঙ্গে অন্য ধাতু টিন প্রভৃতি মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হল এবং তাদের ব্যবহারের ফলে সমাজেও পরিবর্তন এল।

কৃষিকাজ শিখে মানুষ বসতি স্থাপন করে। কয়েকটি বসতি বা পরিবার মিলে গড়ে ওঠে গ্রাম। গ্রামের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যায়। মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় গ্রামও বড় হয়। আগে গ্রামগুলি ছিল কৃষি-নির্ভর। পরে ধাতুর কাজ আরম্ভ হওয়ায় গ্রামের মানুষের কাজ বাড়ল, তারা নানা বৃত্তি ও পেশা শিখতে লাগল। গ্রামে লোকজনের বেশি আনাগোনা হল, হাটবাজার হল, রাস্তাঘাট হল। গ্রামের চেহারা পালটে গেল। গ্রাম বড় হল, হয়ে দাঁড়াল শহর। শহরের প্রয়োজনে ভাল ভাল ঘরবাড়ি হল। শহরের চারধারে উঁচু পাঁচিল গাঁথা হল, যাতে শত্রুরা শহর আক্রমণ করতে না পারে। শহরে দোকানপাট বসল। মানুষ নানা কাজ করে নিজের জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত হল। মানুষের মধ্যে নানা পেশা ও বৃত্তির প্রচলন হল। ক্রমে এই বৃত্তি ও পেশা বংশগত হয়ে সমাজে স্থায়ী হল।

শহরের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবসাবাণিজ্য বেড়ে গেল। ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য এক শ্রেণীর বিশেষ মানুষ গড়ে উঠল। তারা শহরে দোকান সাজিয়ে বসল। নানা দ্রব্য তারা দোকানে রাখত। মানুষ প্রয়োজন মত তাদের কাছ থেকে জিনিস নিত। টাকাপয়সার প্রচলন তখনও হয় নি। ব্যবসাবাণিজ্য চলত বিনিময় প্রথায়। বিনিময় কথার অর্থ হল একটা জিনিসের বদলে আর একটা জিনিস দেওয়া বা নেওয়া। একজন চাষী চাষ করে ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করত। একজন তাঁতী তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করত, সে খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে না। কিন্তু তার খাদ্যদ্রব্যের দরকার। চাষীরও দরকার কাপড়ের। সে কাপড় বুনতে জানে না। চাষী চাল বা গমের বিনিময়ে তাঁতীর কাছ থেকে একখানা কাপড় নিত, তাঁতীও তার দরকার মত চাষীর কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য নিত। কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি সকলেরই এইভাবে চাহিদা মিটত। ব্যবসাবাণিজ্য তখন এইভাবে চলত। এরই নাম বিনিময় প্রথায় ব্যবসাবাণিজ্য।

সমাজজীবনে পরিবর্তন

শ্রেণীভাগ ঃ আদিম রাষ্ট্রব্যবস্থা ঃ গ্রাম শহর হওয়ায় মানুষের জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটল। আগে লোকে কৃষিকাজ করে, যে যার জমিতে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু শহরে বাস করে মানুষ আর কৃষিকাজ করতে পারত না। তারা কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য বৃত্তি ও পেশা গ্রহণ করল। ফলে সমাজে শ্রেণীবিভাগ শুরু হল। যারা ধাতুর কাজ জানত তারা হল কর্মকার। আর একদল লোক যারা খনি থেকে তামা তুলে আনত, তারা হল শ্রমিক। এইভাবে সমাজে তাঁতী, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এইসব শিল্পী ও কারিগরদের হাতের কাজ কিনে নিয়ে একদল লোক আবার দোকান সাজিয়ে বসে কেনাবেচা করত। তারা হল ব্যবসায়ী বা বণিক শ্রেণী। এইভাবে নতুন সমাজ নানা শ্রেণীর পেশা ও বৃত্তির লোক নিয়ে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। ক্রমে সমাজ ধনী ও গরীব এই দুই শ্রেণীর মানুষে ভাগ হয়ে পড়ে। জমির মালিকরা, ব্যবসায়ীরা সম্পদের অধিকারী হয়ে বড়লোক হল, আর খেটে খাওয়া শিল্পী-কারিগররা হয়ে রইল দরিদ্র।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঃ মানুষ গ্রাম ও শহর গড়ে সুখেশান্তিতে দিন কাটালেও তখনও কিছু মানুষ ছিল যারা যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াত। তারা কৃষিকাজ করত না কিংবা এক জায়গায় থাকত না। গ্রামের ও শহরের লোকের উন্নতিতে তারা ঈর্ষা করত। সুযোগ পেলেই তারা গ্রাম ও শহর লুটপাট

করত। গ্রামবাসীদের গোরু-ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে যেত। আগুন লাগিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। শহরও তারা বাদ দিত না। শহরের মানুষ তাদের আক্রমণে বাধা দিত। ফলে যুদ্ধ হত, বহুলোক হতাহতও হত। এইসব যাযাবর উপজাতির মানুষরা সুযোগ পেলে আবার রাজ্যও অধিকার করত। আগের শাসকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই রাজা হয়ে বসত। এমন ঘটনা মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে ঘটেছে, মিশরেও ঘটেছে। পরে আমরা তার আলোচনা করব।

যাযাবর উপজাতির আক্রমণের হাত থেকে শহর রক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আদিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যুদ্ধ করতে হলে একজনের নেতৃত্ব চাই। কেননা যুদ্ধের সময় সবাই মিলে আদেশ দিলে সে যুদ্ধ জয় করা যায় না। আদেশ দেবার একজন থাকে—বাকি সকলে তার কথা মেনে চলে। এইজন্য কিছু নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। মানুষ স্বেচ্ছায় তা মানে। মানুষ দেখেছে তাতে তাদের লাভ হয়। মানুষের মনের এই শৃঙ্খলাবোধ এবং একজনের আদেশ মেনে চলার প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নিয়েছে আদিম রাষ্ট্রের। যুদ্ধকালে যে নেতৃত্ব দিত, যার কথা মানুষ মেনে চলত, যুদ্ধ শেষে সেই হত নেতা। কালক্রমে এই মানুষটি হয়ে দাঁড়াল সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সে হল শাসক। তাকে পরামর্শ দিতে শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। গড়ে উঠল ছোট ছোট রাষ্ট্র। সমাজ এইভাবে রাষ্ট্রের অধীন হল।

নদীতীরে সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ

পৃথিবীর সব বড় বড় প্রাচীন সভ্যতা নদীতীরেই গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের সব সভ্যতার কেন্দ্র ছিল কয়েকটি বড় বড় নদীর তীর।

কৃষিকাজ শেখার পর থেকে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী নতুন রূপ নিল। কৃষির জন্য এক জায়গাতে স্থায়ী হয়ে বসবাস করা দরকার। আর সব জায়গায় কৃষিকাজ হয়ও না। কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন সকলের আগে। জল ছাড়া মানুষও বাঁচে না।

নদীতীরের উর্বর জমি কৃষির খুব উপযোগী। আবার গৃহপালিত পশুর খাদ্যও নদীর ধারে অঢেল পাওয়া যায়। নদীর জল কখনো কমে না। নদী থেকে খাল কেটে কৃষিক্ষেতে জল দেওয়া চলে। বর্ষায় নদীতে প্লাবন হয়। জলের সাথে ভেসে আসা পলিমাটি জমিকে আরও উর্বর করে। তাতে ফসল ভাল হয়।

নদীপথে নৌকো করে দূর দূর দেশে যাওয়া-আসা যায়। ব্যবসাবাণিজ্য করা যায়। তাছাড়া নদীর মাছও খাদ্যের এক অংশ পূরণ করে।

এই সমস্ত সুযোগসুবিধার জন্য প্রাচীনকালের মানুষ নদীতীরে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে তাদের বসতির ফলে গ্রাম গড়ে ওঠে। তারপর গ্রাম থেকে হয় শহর। শহর বড় হয়ে গড়ে ওঠে নগর। মানুষের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) তাম্র ও ব্রোঞ্জের যুগ বলতে কি বোঝ ?
(খ) শহরের অভ্যুদয় ঘটে কিভাবে ?
(গ) তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের উৎপন্ন দ্রব্যে কিরূপ বৈচিত্র্য এল ?
(ঘ) তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে সামাজিক বিবর্তনের একটি বিবরণ দাও।
(ঙ) নদীতীরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কি ?

২। **টীকা লেখ ঃ** (ক) বিনিময় প্রথা, (খ) গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

৩। **সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) কিভাবে সমাজে শ্রেণীবিভাগ শুরু হল ?
(খ) সমাজে ধনী ও দরিদ্র প্রথম সৃষ্টি হল কিভাবে ?
(গ) সমাজে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল কিভাবে ?
(ঘ) তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চলত ?
(ঙ) বিনিময় প্রথার অর্থ কি ?
(চ) কোন সময় হতে প্রস্তর যুগের অবসান হল ?

৪। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(১) বন্ধনীর মধ্যে যে কথাটি ঠিক তা নিয়ে বাক্য ঠিক করে লেখ ঃ

(ক) এ যুগে মানুষ শহর গড়ে (প্রস্তর যুগে, লৌহ যুগে, তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগে)।
(খ) সে সময় ব্যবসাবাণিজ্য চলত (বিনিময় প্রথায়, টাকার মাধ্যমে, জমির মাধ্যমে)।
(গ) তামা আবিষ্কার হলে সমাজে (শ্রেণীর, জনমজুরের, ব্রাহ্মণের) সৃষ্টি হল।
(ঘ) তাম্র যুগে শুরু হয় (শৃঙ্খলাবোধ, অভাববোধ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব)।
(ঙ) প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে (নদীতীরে, বনের মাঝে, পাহাড়ের তলায়)।

(২) **শূন্যস্থানে কথা বসাও ঃ**

(ক) তামার সঙ্গে — মিশিয়ে মানুষ ব্রোঞ্জ তৈরি করে।
(খ) মানুষ প্রথম ব্যবসা শুরু করল — — প্রথায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা, চীন

১। মেসোপটেমিয়া

- অবস্থান ও প্রাচীনত্ব
- মাটি, শস্য, বন্যা-প্রতিরোধ
- উপজীবিকা ● সুমেরের অবদান

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ঃ এশিয়া মাইনর বা পশ্চিম এশিয়ার যে দেশের নাম এখন ইরাক, আগে তার নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া বহু পুরোনো দেশ। বহুকাল এই নামে এই দেশ চলে। পরে হয় ইরাক। দেশের নাম মেসোপটেমিয়া রেখেছিল গ্রীকরা। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ—দুই নদীর মাঝখানের অঞ্চল।

মেসোপটেমিয়া দেশটি গড়ে উঠেছিল দুটি বিখ্যাত নদী তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে। দেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাইগ্রিস এসে পড়েছে পারস্য উপসাগরে। ইউফ্রেতিসও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মিশেছে গিয়ে পারস্য উপসাগরে।

দুটি নদীর জলধারায় পুষ্ট এই দেশ মানুষের বসবাসের পক্ষে ছিল লোভনীয়। তাই আদিকাল থেকেই এখানে মানুষের বসতি। ফলে এখানে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা। মিশরের সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতা বলা হত। এখন জানা গেছে, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা মিশরের সভ্যতার চাইতে পুরোনো। মেসোপটেমিয়া প্রায় সমতলভূমি। পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রের মত কোন প্রাকৃতিক বস্তু দিয়ে এই দেশের সীমা সুরক্ষিত নয়। তাই বার বার বাইরের লোক, যাযাবর মানুষ এই দেশ আক্রমণ করেছে, বসতি স্থাপন করে অনেকে আবার রয়েও গেছে।

এই দেশে প্রথম যারা সভ্যতা গড়ে তারা হল সুমেরীয়। তারা বাইরে থেকেই এ দেশে এসেছিল এবং সুমের নামে এক জায়গায় বসবাস শুরু করেছিল। সুমেরে বাস করত বলে তাদের বলা হয় সুমেরীয় এবং তাদের তৈরী সভ্যতার নাম হয় সুমেরীয় সভ্যতা। প্রায় ছ' হাজার বছর আগে সুমেরীয়রা মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতা বিস্তার করে।



প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তি-স্থল

সুমের বা মেসোপটেমিয়ায় তখন কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রগুলি ছিল খুবই ছোট। তাদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লেগেই থাকত। তা সত্ত্বেও তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল, তাদের আর্থিক উন্নতি দেখে উপজাতীয় যাযাবররা বার বার তাদের আক্রমণ করত।



প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ : মেসোপটেমিয়া

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশ আশি বছর আগে একজন উপজাতির নেতা সারগন মেসোপটেমিয়ার রাজ্যগুলি অধিকার করে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সারগন ও তাঁর লোকজন সুমেরের ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। সারগনের সাম্রাজ্য একশ বছর টিকেছিল। এই সময়ের মধ্যে সুমেরীয়রা নানা দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি করে। এইজন্য এই কালকে সুমেরের সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়।

মাটি, শস্য, বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থা: দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়ার জমি ছিল খুব উর্বর। নদীর জলে দেশ ভেসে যেত। তাই মেসোপটেমিয়া ছিল ঝিল, খাল আর জলাভূমিতে ভরা। সুমেরের লোকেরাই প্রথম জলনিকাশের ব্যবস্থা করে। জলাভূমি থেকে খাল নালা কেটে জল বের করে দিয়ে জায়গাটিকে তারা কৃষিকাজ ও বসবাসের উপযোগী করে তোলে।

সুমেরে শস্য হত প্রচুর। এখানকার জমি এত উর্বর ছিল যে, যা লাগানো হত তার শতগুণ ফসল পাওয়া যেত। এখানে নানা ধরনের খাদ্যশস্য, শাক-সবজি ও ফল জন্মাত। ফলের মধ্যে খেজুর প্রধান। ইরাকের উৎকৃষ্ট খেজুরের চাহিদা এখনও আছে।

'-তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদীতে প্রতি বছরই বন্যা আসত। ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য সুমেরবাসীরা নদীতে বাঁধ দিত। বাঁধ বেঁধে বন্যার অতিরিক্ত জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করত। পরে এই জল নিয়ে মাঠের কাজে লাগিয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করত। বাঁধ থেকে জল নেবার জন্য দেশজুড়ে খাল ও নালা কাটা হত।

সুমেরবাসীরা প্রথমে নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা প্রচলন করায় অনেক দেশে পরে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপজীবিকা ঃ সুমেরের লোকদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। কৃষি ছাড়া তারা আরও নানা কাজ করত। দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তাই বহু মানুষ সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করত।

সুমেরের লোক পশমের কাপড় বুনতে পারত। তারা খুব ভাল শাল আর কারপেট তৈরি করতে পারত। সোনারুপো দিয়ে সুন্দর গয়না তৈরি করত। অনেকে বলে, সুমেরের মানুষরাই কুমোরের চাকায় প্রথম মাটির পাত্র গড়তে শুরু করে। চাকা তারা অন্য কাজেও ব্যবহার করত। যুদ্ধের জন্য তাদের রথ ছিল। রথ চলত চাকার উপর। যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করত ব্রোঞ্জ দিয়ে। চেয়ার, টেবিল, মাদুর সবকিছু তারা তৈরি করতে পারত। মালপত্র নেওয়ার জন্য তারা ঠেলাগাড়ি ব্যবহার করত।

ব্যবসাবাণিজ্য করেও সুমেরের লোক উন্নতি করেছিল। সুমেরের বণিকরা খাদ্যশস্য, গরম কাপড়, খেজুর এবং তাদের তৈরী ধাতুর দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসত। বিদেশ থেকে তারা নিয়ে আসত সোনা, রুপো, তামা আর মূল্যবান রত্নরাজি হীরা প্রভৃতি।

সুমেরের অবদান ঃ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সুমের অনেক অবদান রেখে গেছে। বহু জিনিস তারা আবিষ্কার করেছিল। তাদের আবিষ্কার করা অনেক জিনিস এখনও সারা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করছে।

সুমেরীয়রা অনেক শহর গড়েছিল। তাদের প্রত্যেক শহরের জন্য একজন করে দেবতা থাকত। দেবতার জন্য তারা বিরাট বিরাট মন্দির তৈরি করেছিল। তাদের বড় দেবতা এনলিন-এর জন্য নিপ্পার শহরে সব চাইতে

বড় মন্দির নির্মিত হয়েছিল। নিপ্পার শহর ছিল ইউফ্রেতিস নদীর ধারে। এনলিন ছিলেন বায়ুর দেবতা। সুমেরের মন্দিরের নাম জিগুরাত। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে মন্দির তৈরি করা হত। এতে অসংখ্য ঘর থাকত। এর মধ্যে স্কুলও বসত।

সুমেরের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন মন্দিরের দেবতা। পুরোহিত শাসকরা দেবতার নাম করে চাষবাসের জন্য জমি বিলি করত। কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ মন্দিরে দিত। এই শস্য মন্দিরের গুদাম ঘরে জমা রাখা হত। চাষবাসের যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি পুরোহিতরা কৃষকদের দিত। অনেক সময় গরীব মানুষদের মন্দির থেকে খাওয়ানো হত।

সুমেরীয়রা ইট দিয়ে মন্দির, বাড়ি তৈরি করত। নানা চিত্রে তারা মন্দির সাজাত। মন্দিরের দেয়ালের ওপর ছবি আঁকত। একে বলা হয় দেয়ালচিত্র বা 'ফ্রেসকো'।

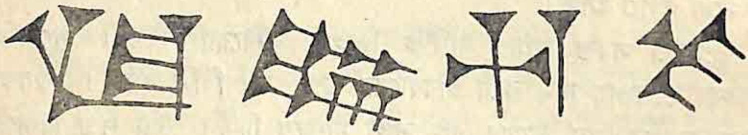
মেসোপটেমিয়ায় পাথর পাওয়া যেত না। তাই তারা মাটি কেটে ছাঁচে ঢেলে ইট তৈরি করত এবং তা পুড়িয়ে তা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করত। তবে পাথরের কাজও তারা জানত। পাথর কেটে তারা নানা মূর্তি তৈরি করেছিল। পাথর তারা আনত অন্য দেশ থেকে।

ধাতুবিদ্যায়ও তারা দক্ষ ছিল। তামার সাথে অন্য ধাতু, যেমন দস্তা কি টিন মিশিয়ে তারা মিশ্র ধাতু ব্রোঞ্জ তৈরি করেছিল। তামার চাইতে ব্রোঞ্জ অনেক শক্ত। এই ধাতু দিয়ে তারা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত। কুঠার, বর্শা প্রভৃতি ছিল তাদের যুদ্ধের অস্ত্র। তারা যুদ্ধে ঢাল এবং ধাতুর তৈরী শিরস্ত্রাণ বা টুপির মত একরকম জিনিস ব্যবহার করত। এটা তৈরি হত তামা দিয়ে। যুদ্ধে তারা রথ ব্যবহার করত। রথের চাকাতেও তারা ধাতুর আবরণ দিত। যানবাহনের জন্য তাদের চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি ছিল।

ব্যবসাবাণিজ্যে সুমেরের লোক দক্ষ ছিল। বিদেশের সঙ্গেও তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তারা যে ভারতের সিন্ধু উপত্যকার লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের ভেতর পাওয়া সুমেরীয় ভাষার লেখা থেকে।

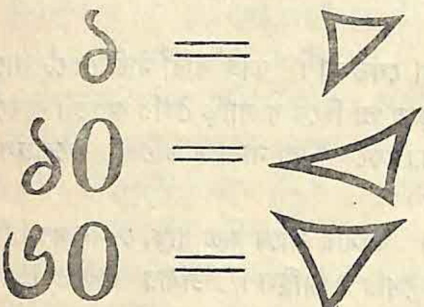
সুমেরের লোকেরা যে অক্ষরে লেখাপড়া করত বাংলায় তাকে বলা হয় কীলকাক্ষর। ইংরেজিতে এর নাম কিউনিফরম (cuneiform)। এই অক্ষর দেখতে অনেকটা মাথামোটা কীল বা গজালের মত বলে এই নাম হয়েছে। তাদের কালে কাগজ ছিল না। তারা লিখত নরম মাটির ছোট ছোট টালির

ওপর খাগের কলমের মত এক ধরনের কলমের মাথায় চাপ দিয়ে। লেখার পর টালিগুলো রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। তারা লিখত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।



কীলকাক্ষর

সংখ্যা লেখবার জন্য তাদের তিনটি চিহ্ন ছিল। এক, দশ এবং ষাট। এই তিনটি চিহ্ন দিয়ে তারা যে কোন সংখ্যা লিখতে পারত।



সংখ্যালিখন প্রণালী

সুমেরের মানুষরা অনেক নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিল—ষাট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা ইত্যাদি। পৃথিবীর সমস্ত লোক যা এখন মেনে চলছে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি আগে সুমেরের লোক তা আবিষ্কার করে। একটি বৃত্তের মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রি আছে, তাও তারাই প্রথম বের করেছিল।

বৃত্তের ৩৬০ ভাগ ডিগ্রি থেকে তারা বের করল বছরের ৩৬০ দিন। ৩৬০ দিনকে ১২ ভাগ করে পেল মাসের ৩০ দিন। ১২ মাসের ৩৬০ দিনের বছর গোনার রীতি সুমেরের মানুষ পাঁচ হাজার বছর আগে ঠিক করে দিয়ে গেছে। বারো ঘণ্টায় দিন আর বারো ঘণ্টায় রাত্রির হিসাব তাও সুমেরের মানুষদের ঠিক করা। এছাড়া বাজারের জিনিসপত্র ওজন ও মাপ ঠিক রাখার জন্যও তারা বাটখারার প্রচলন করেছিল। তখন টাকাপয়সা বা মুদ্রার জন্ম হয় নি। এর প্রয়োজন মিটিয়েছিল তারা রুপোর পাতের প্রচলন করে। এই নিয়ম থেকে পরে রুপোর মুদ্রা তৈরি শুরু হয়।

সুমেরের জ্যোতির্বিদরা আকাশের গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতেন। তাঁরা হিসাব করে বলে দিতে পারতেন কবে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে।

গ্রহতারার অবস্থান হিসাব করে তাঁরা মানুষের অদৃষ্ট বা ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। সুমেরের পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের জীবনের ওপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মেসোপটেমিয়ার অবস্থান ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) সুমেরের অবদান সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(গ) সুমেরবাসীরা কিভাবে বন্যা প্রতিরোধ করত বর্ণনা কর।

(ঘ) সুমেরবাসীদের জলসেচ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল বল।

(ঙ) সুমেরবাসীদের উপজীবিকা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(চ) সুমেরবাসীদের সমাজব্যবস্থা ও শিল্প নিদর্শন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। **সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি ?

(খ) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কি ?

(গ) কারা মেসোপটেমিয়া নাম রেখেছিল ?

(ঘ) মেসোপটেমিয়ার দুই নদীর নাম বল।

(ঙ) সারগন কে ছিলেন ? ইতিহাসে তিনি কি জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন ?

(চ) সারগন কত বছর সাম্রাজ্য করেছিলেন ?

(ছ) সংখ্যা লেখার জন্য সুমেরীয়রা কয়টি চিহ্ন ব্যবহার করত ?

৩। **টীকা লেখ ঃ** (ক) কীলকাক্ষর (খ) ফ্রেসকো (গ) এনলিন।

৪। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বর্তমান নাম —।

(খ) সুমেরের মন্দিরের নাম —।

(গ) নিপ্পার শহর ছিল — — ধারে।

(ঘ) সুমেরের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন — —।

(ঙ) — ও — নদীতীরে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে।

Lack of pictures & illustration

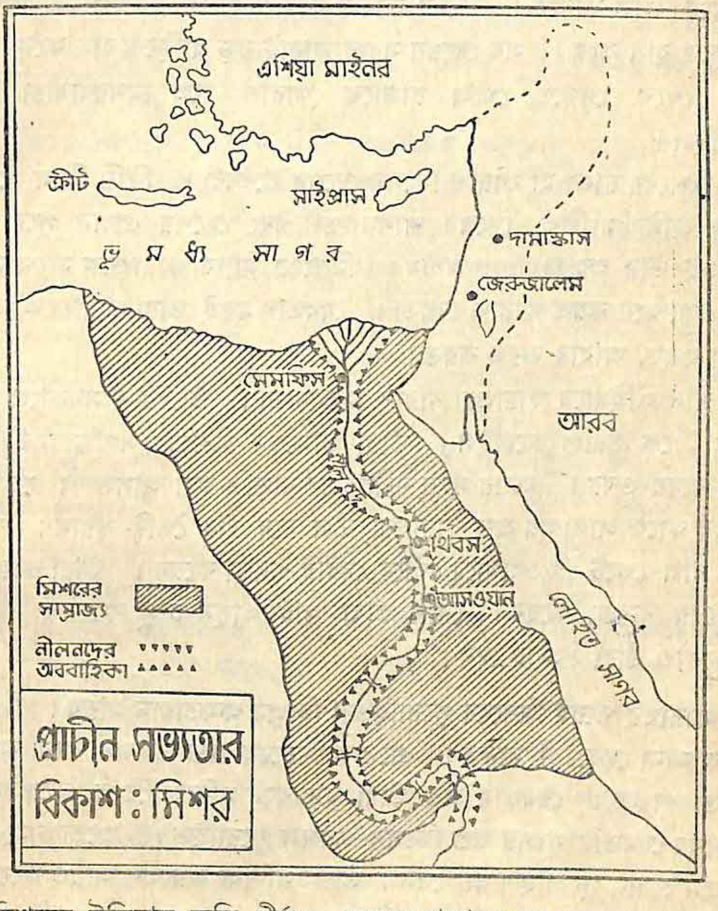
২। মিশর

- অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি
- ফারাও, পুরোহিত, বর্ণমালা, করণিক, কর আদায়কারী, সৈনিক
- ব্যবসাবাণিজ্য
- পিরামিড
- ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস
- জনগণের জীবনযাত্রা

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি : মিশর দেশের নাম তোমরা হয়ত শুনেছ। আফরিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে এই দেশ। এই দেশের উত্তরে ভূমধ্যসাগর আর বাকি তিন দিকে আফরিকার মরুভূমি। এই কারণে মিশরের আবহাওয়া শুকনো ও গরম। উত্তর আফরিকার মিশর ছাড়া প্রায় সবটাই মরুভূমি অঞ্চল। মিশরকে মরুভূমি হতে দেয় নি নীল নদ। নীল নদ মিশরের প্রাণ, মিশর নীল নদের দান। এই নদের দুই তীরে মিশর দেশের অবস্থিতি। মিশরের যত কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ তা আছে এই নীল নদের তীরে, আর মানুষ যা কিছু গড়েছে তাও করেছে এই নদের ধারে। নীল নদের জল মিশরের মাটি ভিজিয়ে না রাখলে এখানে মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব হত না।

বছরে একবার করে নদীতে বন্যা আসত। বন্যার জল তীরের জমি প্লাবিত করত। নদীর জলের সঙ্গে মিশে থাকা পলিমাটি জমিতে পড়ে জমি হত উর্বর। কৃষির জন্য এই পলিমাটি পড়া জমি খুব ভাল। ফসল হত প্রচুর। মানুষ বা পশুর খাদ্যের অভাব হত না। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই নীল নদের দু'ধারে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। প্রায় চারদিক থেকে জায়গাটি সুরক্ষিত থাকায় মানুষরা অবাধে নিজেদের উন্নতি করতে পেরেছিল। ফলে অতি প্রাচীনকালেই মিশরে সৃষ্টি হয়েছিল এক উন্নত সভ্যতা। এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে মিশর অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যেরই একজন করে রাজা ছিলেন। রাজ্যের আলাদা রাজধানী ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের পৃথক দেবদেবীও ছিল। রাজারা সকলেই চাইতেন নীল নদের ওপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করতে। কারণ নীল নদের জলে মিশর বেঁচে ছিল। সকল রাজ্যের মানুষই নীল নদের ওপর নির্ভর করত। তাই নীল নদ দখলে রাখতে পারলে সমগ্র মিশরের ওপর কর্তৃত্ব করা সহজ। এর জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত। এমনি একজন রাজা

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সমগ্র মিশর নিজের অধীনে এনে মিশরকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। এই রাজার নাম হল মেনেস। তাঁর রাজধানী ছিল মেমফিস নগরে। মেনেসের বংশের রাজারা প্রায় তিনশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।



মিশরের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। কয়েক হাজার বছর ধরে বহু রাজবংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। দীর্ঘ কালের এই ইতিহাসকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়। আদিকাল থেকে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১৫৮০ বছর আগের কাল পর্যন্ত সময়কে বলা হয় পুরানো রাজ্যের আমল। এর পর থেকে যীশুর জন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগের যুগের সময়কে বলা হয় নতুন রাজ্যের আমল। তার পর থেকে শুরু হয় মিশরের দুর্দিন। বিদেশী শক্তি

মিশর অধিকার করে। মিশরের মানুষ স্বাধীনতা হারায়। এই স্বাধীনতা মিশর ফিরে পায় হাল আমলে আমাদের কালে বিংশ শতাব্দীতে।

ফারাও : পুরোহিত : বর্ণমালা : করণিক : কর আদায়কারী : সৈনিক : সমগ্র মিশরের প্রথম রাজার নাম হল মেনেস। মিশরের লোক রাজাকে বলত ফারাও। তাদের ভাষায় ফারাও কথার অর্থ হল যে মানুষ বড় বাড়িতে বাস করে। সব দেশের সব রাজারাই বড় বাড়িতে বাস করে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে রাজাকে ফারাও বলে মিশরবাসীরা ঠিকই করেছিল।

মিশরের রাজা বা ফারাও ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তিনি ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক, দেশের শাসনকর্তা এবং দেশের প্রধান পুরোহিত। কাজেই তাঁর ক্ষমতা ছিল অসীম। মিশরের মানুষ ফারাওকে মানুষ ভাবত না, তারা মনে করত ফারাও দেবতা। দেবতার মতই তারা ফারাওকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, আবার ভয়ও করত।

শাসক হিসাবে ফারাওরা খারাপ ছিলেন না। তাঁদের শাসনকালে মিশর নানা দিকে উন্নতি করেছিল। তাঁরা জানতেন মিশরের সমৃদ্ধি নির্ভর করে নীল নদের ওপর। বন্যার সময় নদীতে যে বাড়তি জল আসত তা ধরে রেখে চাষের কাজে লাগাবার জন্য ফারাওরা নীল নদে বাঁধ তৈরি করান। বাঁধের জল খাল কেটে ক্ষেতখামারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত বিচারের ব্যবস্থা করেন। দেশে ন্যায্য আইনকানুন চালু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁরা উৎসাহ দেন।

ফারাওর পরেই মিশরের পুরোহিতরা ছিলেন ক্ষমতাবান মানুষ। মিশরের লোক নানা দেবদেবী মানত। প্রত্যেক শহরের জন্য একজন করে আলাদা দেবতা থাকত। দেবতার জন্য তাঁরা বড় বড় মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরের দেবতার পূজার জন্য ছিলেন একদল পুরোহিত। প্রত্যেক মন্দিরেই একজন প্রধান পুরোহিত থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন আরও কয়েকজন পুরোহিত। তাঁরা পালা করে মন্দিরের কাজ করতেন। পুরোহিতরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তাঁরা সাদা জামাকাপড় পরতেন, মাথা মুড়িয়ে ফেলতেন। তাঁরা মাছমাংস, পিঁয়াজরসুন, ডিম খেতেন না। স্ত্রীলোক পুরোহিতও ছিলেন। তবে তাঁরা কেবল স্ত্রীদেবতার পূজাই করতে পারতেন। পুরোহিতরা হতেন সব পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁরা ভাল লেখাপড়া জানতেন। অনেক মন্ত্রতন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা তাঁদের জানা ছিল। মিশরের মানুষ পুরোহিতদের

খুব ভক্তি করত, ভয়ও করত। কেননা তারা মনে করত পুরোহিতরা হলেন দেবতারই লোক।

পুরোহিতরা শিক্ষকতার কাজও করতেন। প্রত্যেকটি মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা থাকত। এখনকার স্কুলের মত তখন এইগুলি স্কুল ছিল। এক স্কুলের পড়া শেষ হলে ছাত্ররা অন্য স্কুলে যেতে পারত। লেখাপড়ার শেষে তারা চাকরি পেত। বিদ্যালয়গুলির খরচপত্র সরকার দিত। পুরোহিতরা মানুষের অসুখবিসুখে ভালো ওষুধ তৈরি করে দিতেন। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

পুরোহিতরা মিশরের পুরাতন লিপি আবিষ্কার করেন। এই লিপিকে ইংরেজিতে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্স, বাংলায় এর অর্থ চিত্রলিপি। অক্ষর সাজিয়ে যেমন কথা লেখা হয় চিত্রলিপিতে তা করা হত না। কোন জিনিসের চিত্র বা ছবি এঁকে জিনিসটা বোঝান হত। নানা জিনিসের ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। পরে এই চিত্রগুলি অক্ষরের রূপ নেয়।



চিত্রলিপি

লেখবার জন্য তারা এক ধরনের কাগজ বের করেছিল। প্যাপিরাস নামে এক জাতের ঘাস জুড়ে জুড়ে কাগজের মত করে তার ওপর খাগের কলম দিয়ে লিখত। কালি তৈরি করত আঠা, পাতার রস আর ঘরের ঝুলকালি মিশিয়ে। মিশরের প্যাপিরাস কথা থেকে ইংরেজি পেপার কথা জন্ম নিয়েছে। মিশরের পুরোহিতরা সৌরপঞ্জিকা তৈরি করেছিলেন। এতে বছর গণনা করা হত ৩৬৫ দিনে। ১২ মাস ও চার ঋতুতে তাদের বছর হত। প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে এবং শেষ পাঁচ দিন ধরে রাখা হয়েছিল উৎসবের জন্য।

মিশরের চার ঋতু হল শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ। মিশরে বর্ষা হয় নি। তাই তাদের বর্ষা ঋতু নেই।

মিশরের বিজ্ঞানীরা জ্যামিতিতে উন্নতি করেছিল। তবে গণিত শাস্ত্রে তারা একটু কাঁচা ছিল।

চিত্রলিপিতে লেখাপড়া করা সহজ ছিল না। সকলে ছবি আঁকতে পারত

না, পড়তেও পারত না। লেখাপড়া করত পুরোহিতরা এবং আর এক ধরনের বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। এদের বলা হত করণিক বা কেরানি। লেখাপড়ায় বিশেষভাবে চিত্রলেখায় এরা অভিজ্ঞ ছিল। মনিবরা মুখে মুখে বলে যেত, এরা লিখে নিত। কেরানিরা সরকারী দপ্তরের হিসাবপত্র রাখত। মাটিতে বসে হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে এরা লিখতে অভ্যস্ত ছিল।

মিশরের সব কথা জানা যায় মিশরের চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের পর থেকে। একজন ইংরেজ পণ্ডিত টমাস ইয়াং ও একজন ফরাসী পণ্ডিত সাঁপিলিয়ঁ একখানা পাথরের লেখা পড়ে চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। এই পাথরখানার একদিকে চিত্রলিপিতে ও অপর দিকে গ্রীক অক্ষরে লেখা ছিল। গ্রীক ভাষার সাহায্যে চিত্রলিপির লেখা পড়া সম্ভব হয়। এই পাথরখানাকে বলা হয় 'রসেটা' পাথর।

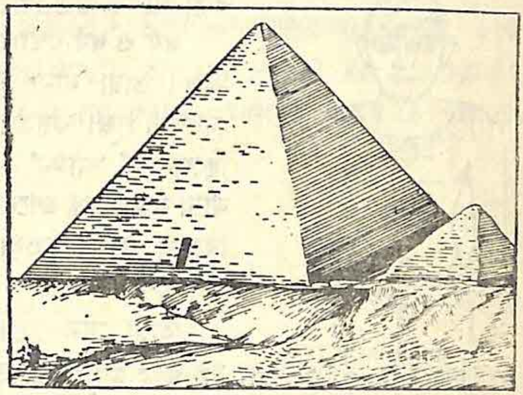
ট্যাক্স বা কর আদায়ের প্রথা মিশরে খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। প্রতি বছর বন্যার জলে চাষীদের জমিজমা সব ধুয়েমুছে যেত। জল সরে গেলে কার কোন জমি, কতটা জমি, তা নিয়ে চাষীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ মারামারি হত। এই অবস্থার পাকাপাকি সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিল একদল স্থানীয় নেতা। এরা হিসাব করে, মাপজোক করে চাষীদের জমির সীমানা ঠিক করে দিত। বিনিময়ে কৃষকদের কাছ থেকে শস্যের অংশ নিত। কালক্রমে এই নিয়ম দেশের সর্বত্র প্রচলিত হয় এবং সরকারও এইভাবে কর আদায় করতে থাকেন। কর আদায়ের জন্য তাঁরা আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করতেন, এঁরা হল কর আদায়কারী। চাষীদের বাড়ি গিয়ে এঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল আদায় করে রাজ সরকারে জমা দিতেন।

মিশরের সৈনিক আসত চাষী পরিবার থেকে। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধ করত। অন্য সময় করত চাষবাসের কাজ, শ্রমিকের কাজ। মিশরে শ্রমিকের কাজ বেশির ভাগ করানো হত ক্রীতদাসদের দিয়ে। মিশরের বড় বড় পিরামিড, মন্দির সব তৈরি হয়েছিল এইসব দাস শ্রমিকদেরই পরিশ্রমে।

ব্যবসাবাণিজ্য ঃ প্রাচীন মিশরের লোকেরা ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে দক্ষ ছিল। তারা বিদেশের সাথেও বাণিজ্য করত। ফারাওরা ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন। মিশরে প্রচুর পরিমাণে চাল, গম, যব ও নানারকম ফল জন্মাত। মিশরের আঙ্গুর ও ডালিম প্রসিদ্ধ। ব্যাপারীরা এই সমস্ত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করত। মিশরে ভাল তুলো জন্মাত। এই তুলোও

তারা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন দেশে, ইউরোপে এবং ভারতে বিক্রি করত। মিশরের তৈরী অনেক জিনিস ভারতের মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে।

পিরামিড ঃ মিশরের ফারাওদের অমরকীর্তি তাঁদের পিরামিডগুলি। এগুলি এখনও মানুষের মনে বিস্ময় জাগায়। এত বিরাট বিরাট পিরামিড কি ভাবে তাঁরা তৈরি করিয়েছিলেন সেই রহস্য এখনও কেউ জানে না।


মিশরের পিরামিড

পিরামিড আসলে ফারাওদের কবর। প্রত্যেক ফারাও নিজের রাজত্বকালে যত টাকা-পয়সা বাঁচাতে পারতেন তা দিয়ে আগে থাকতেই নিজের কবর তৈরি করে রাখতেন। কোন কোন পিরামিড অবশ্য মিশরের লোকেরাই ফারাওর মৃত্যুর পর তৈরি করেছিল।

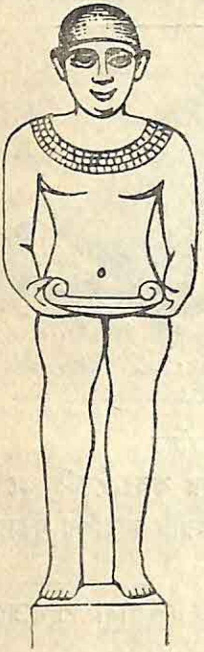
পিরামিড তৈরি হত নিরেট পাথর দিয়ে। এর এক-একখানা পাথরের ওজন প্রায় পাঁচ মেট্রিক টন।

পাথরগুলো এমন সুন্দরভাবে জোড়া লাগান যে, এখনও কোন পাথরের ফাঁকে একখানা ছোট ছুরি পর্যন্ত ঢোকান যায় নি।

মিশরে বড় পিরামিড আছে তিরিশটা। ছোট অনেক। এর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে বিখ্যাত। সব চাইতে বড় পিরামিডটির উচ্চতা চারশ পঞ্চাশ ফুট (প্রায় ১৩৮ মি.), পরিধি সাতশ ফুট (প্রায় ২১৪ মি.)। এই পিরামিডটি তৈরি করিয়েছিলেন ফারাও খুফু, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এটি নির্মাণ করতে লেগেছিল তেইশ লক্ষ পাথরের চাঁই। এর এক-একখানার ওজন আড়াই মেট্রিক টন। এক লক্ষ শ্রমিক বিশ বছর কাজ করে এর নির্মাণকার্য শেষ করেছিল। নীল নদের পশ্চিম তীরে পিরামিডগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

পিরামিড বাদে ফারাওরা অনেক বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সব চাইতে বড় দেবতা 'আমন' ও 'রা'-এর জন্য যে মন্দির

মিশরীয়রা তৈরি করেছিল তা থেকে তাদের নির্মাণ সৌকর্য ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমন দেবতার আর একটা মন্দির ছিল কারনাক নামে এক জায়গায়। মন্দিরটি সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করা অনেক স্তম্ভ দিয়ে সাজান ছিল।



চিকিৎসাদেবতা

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস ঃ মিশরের মানুষ ধর্মবিশ্বাসী ছিল। তারা নানা নামের নানা ধরনের ঠাকুর-দেবতার পূজা করত। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'রা', 'আমন' এবং 'ওসিরিস'। দেবতাজ্ঞানে নানা রকম জন্তু জানোয়ারেরও তারা পূজা করত। বিড়াল কুমির ভেড়া জলহস্তী সকলেই তাদের পূজা পেত।

তারা মনে করত মৃত্যুর পরও জীবনের শেষ হয় না। মানুষ আবার জীবন পায়। মৃত দেহ ভাল ভাবে রাখতে পারলে পরবর্তী জীবনও ভাল হবে। এই বিশ্বাস থেকে মিশরে মৃতদেহকে 'মমি' করে রাখার রীতি প্রচলিত হয়। মানুষের জীবনে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয়, মৃত্যুর পরও তার দরকার আছে, মিশরীয়রা তাও বিশ্বাস করত। এইজন্য মমির সঙ্গে নানা রকমের মূল্যবান সামগ্রী এমন কি খাবারও কবরে রাখা হত। সঙ্গে থাকত মৃত ব্যক্তির নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র। এই ধরনের বিশ্বাস সাধারণ মানুষের যেমন ছিল, ফারাওদেরও তেমনি ছিল। ফারাওদের কবর খুঁড়ে নিত্য ব্যবহারের বহু জিনিস পাওয়া গেছে।



মমি

জনগণের জীবনযাত্রা ঃ মিশরের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। তাদের মধ্যে শিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কাজের মানুষ

ছিল। মিশরের তাঁতীরা অতি সুন্দর মিহি কাপড় বুনতে পারত। তাদের কুমোররা সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি করতে দক্ষ ছিল। কাঁচের পাত্রও তারা তৈরি করত। মাটির এবং কাঁচের পাত্রে রঙ দিয়ে তারা নানা চিত্র আঁকত। চামড়ার জুতো তৈরি করার কারিগরও তাদের মধ্যে ছিল। ইটের কাজ, কাঠের কাজ, সব তারা করতে পারত। নদীতে বাঁধ বাঁধবার, খাল কাটবার দক্ষ কারিগর প্রাচীন মিশরে ছিল। মিশরের মানুষ নৌবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিল।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মিশর একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হতে পেরেছিল কেন? মিশরীয় সভ্যতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(খ) প্রাচীন মিশরের ফারাওদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(গ) মিশরের লোকের ধর্মবিশ্বাস ও বৃত্তি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঘ) মিশরের কর আদায়কারী ও পুরোহিতদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ঙ) মিশরের 'মমি' সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) মিশর দেশটি কোথায় অবস্থিত?

(খ) মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন?

(গ) 'ফারাও' শব্দের অর্থ কি? কাদের ফারাও বলা হত?

(ঘ) পিরামিড কি? সবচেয়ে বড় পিরামিড কোনটি? কে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন? এর উচ্চতা কত?

(ঙ) 'রসেটা' শব্দের অর্থ কি?

(চ) হায়ারোগ্লিফিকস বলতে কি বোঝ?

(ছ) পেপার ইংরেজি কথাটি কিভাবে এসেছে?

৩। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) কে মিশরকে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন?

(খ) মিশর কবে স্বাধীনতা ফিরে পায়?

(গ) সমগ্র মিশরের প্রথম রাজার নাম কি?

(ঘ) মিশরের লিপির নাম কি?

৪। **নিচের বাক্যগুলি যেটি ঠিক তার পাশে টিক চিহ্ন (✓) এবং যেটি ভুল তার পাশে কাটা (×) চিহ্ন দাও।**

(ক) মিশরের প্যাপিরাস কথা থেকে ইংরেজি পেপার কথা জন্ম নিয়েছে।
(খ) মিশরে বর্ষা ঋতু আছে।
(গ) মিশরের সকলে ছবি আঁকতে পারত।
(ঘ) মিশরের মানুষ ধর্মবিশ্বাসী ছিল।

৫। **টীকা লেখ ঃ**

(ক) মমি (খ) প্যাপিরাস (গ) ফারাও (ঘ) পিরামিড।

৬। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন —।
(খ) — দেশের রাজাদের ফারাও বলা হত।
(গ) মিশর দেশটি — মহাদেশে অবস্থিত।
(ঘ) ফারাওদের পরেই মিশরের — ছিলেন ক্ষমতাবান মানুষ।
(ঙ) মিশরের ক্রীতদাসদের বলা হত ——।
(চ) মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর — আছে।

৭। **যে কথাটি ঠিক তার তলায় দাগ দাও ঃ**

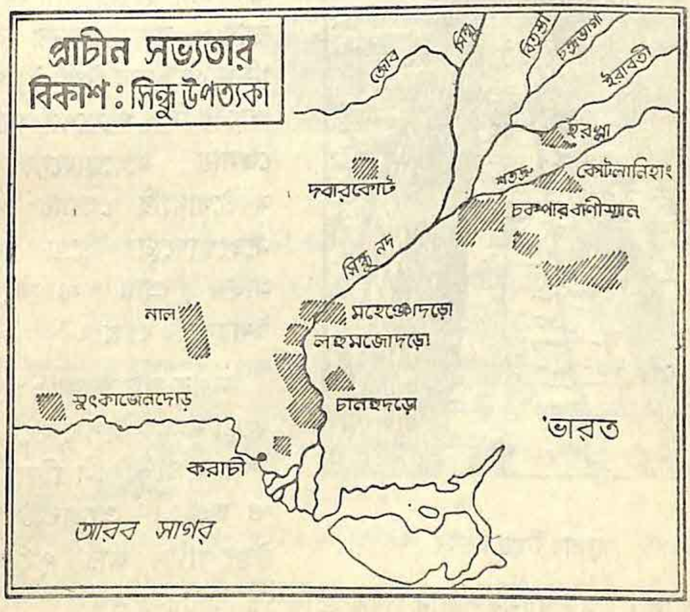
(ক) মিশর দেশটি (আফ্রিকা/ইউরোপে) অবস্থিত।
(খ) মিশরীয়দের লিপিকে বলা হত (রসেটা/হায়ারোগ্লিফিকস্)
(গ) মিশরের বিখ্যাত নদীটির নাম (নীল/লাল)
(ঘ) মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডের উচ্চতা (১৩৮ মি./১৮৩ মি.)।
(ঙ) মিশরের একজন ফারাও-এর নাম (সারগন /খুফু)

নির্দেশ ঃ কলিকাতার যাদুঘরে মমি কেমন দেখলে লেখ।

৩। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

- আবিষ্কার
- নগর-পরিকল্পনা
- খাদ্য-বস্ত্র, তৈজসপত্র
- শিল্প-বাণিজ্য, ধর্মাচরণ
- সামাজিক অবস্থা

আবিষ্কার ঃ একশ বছরেরও আগে পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু প্রদেশে যখন রেল লাইন পাতা হচ্ছিল তখন একদিন কাজের জন্য কিছু পাথর আর ইটের দরকার হল। পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর ধারে হরপ্পা বলে একটা জায়গায় অনেক পাথরের টুকরো আর পুরানো ইট পাওয়া গেল। জায়গাটা উঁচুনীচু ঢিপি আর ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ির জিনিসপত্রে ভরতি। কাজের জন্য দরকারী ইটপাথর এখান থেকে নেওয়া হল। ইটপাথর তুলতে গিয়ে পাওয়া গেল পুরানো আমলের কিছু কিছু জিনিসপত্র। এই রকম আর একটা জায়গা দেখা

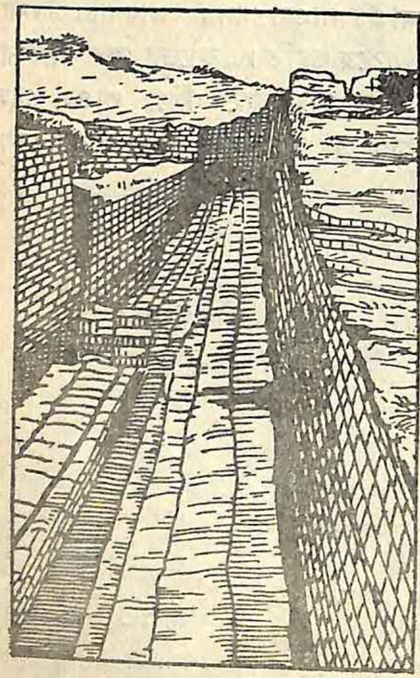


গেল সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু প্রদেশে। স্থানীয় লোকেরা জায়গাটাকে বলত মহেঞ্জোদড়ো। সিন্ধী ভাষায় এই কথার অর্থ 'মড়ার ঢিপি'। এই সমস্ত আবিষ্কারের সংবাদ ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগেও পৌঁছল।

অনেকদিন পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেকটার সার জন মারশাল আর তাঁর সহযোগী ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহনীর মনে হল, এই জায়গা দুটো খুঁড়লে প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হল।

এই ঘটনা ১৯২২ সালের। আরও পরে অনুসন্ধান করে মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা নগরের মত সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায় চানহুদড়ো, ঝুংকাজেনদড়ো এবং আরও নানা জায়গায়। সিন্ধু নদের উপত্যকাকে আশ্রয় করে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েছেন সিন্ধু সভ্যতা।

সিন্ধু সভ্যতা কত পুরানো তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে নি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, পাঁচ হাজার বছরেরও আগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।



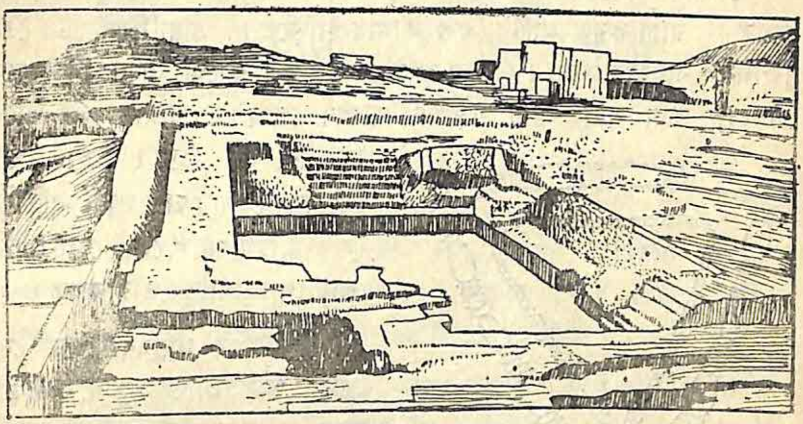
রাস্তার নিচে নর্দমা

মহেঞ্জোদড়ো অঞ্চলের এখনকার স্থানীয় নাম নাথলীস্তান। নাথলীস্তানের অর্থ—'সিন্ধু প্রদেশের উদ্যান'। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদড়ো আর মনটগোমারি জেলায় হরপ্পা। মহেঞ্জোদড়োর প্রায় চারশ মাইল (প্রায় ৬৪৪ কি. মি.) উত্তর পুবে হরপ্পা।

নগর-পরিকল্পনা ঃ মহেঞ্জোদড়ো নগরটি ছিল সুপরিকল্পিত। নগরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। প্রত্যেকটি রাস্তা উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরাল। মাঝখানের প্রধান পথটি প্রায় ১১ মিটার প্রশস্ত। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা বের করা ছিল। রাস্তার দুপাশে পাকা ইটের তৈরী সব অট্টালিকা, বাড়িঘর। বাড়িঘরে সুন্দর জানালা। নগরের ময়লা জল যেত রাস্তার নিচে নর্দমা দিয়ে। দুপাশের বাড়ির জল নর্দমায় এসে পড়ত।

রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত করে দেওয়া হত। রাস্তার দুপাশের জল এই সব গর্তেও এসে পড়ত। পরে তা পরিষ্কার করা হত। সমগ্র নগরটি ছিল কয়েকটি পল্লীতে ভাগ করা। হরপ্পা নগর ছিল চারদিকে দেয়ালঘেরা। মহেঞ্জোদড়ো নগর কোন দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল না।

মহেঞ্জোদড়ো নগরে একাধিক তলের বাড়ি ছিল। দোতলা-তিনতলায় ওঠবার সিঁড়ি ছিল। ঘরের মেঝে এবং দেয়াল মসৃণভাবে আস্তরণ দেওয়া হত। প্রত্যেক বাড়িতেই কুয়ো, স্নানের ঘর এবং পায়খানা থাকত। নগরের



স্নানাগার

মাঝখানে ছিল খুব বড় একটা স্নানাগার এবং কুয়ো। বহু মানুষ এখানে স্নান করত। স্নানের পর কাপড় ছাড়বার জন্য আলাদা ঘরও ছিল।

মহেঞ্জোদড়ো নগর ছিল দুই অংশে গড়া। ওপরদিকে বা উঁচু অংশে থাকত বড়লোকেরা। সরকারী বাড়িঘর, পূজাঅর্চনার জায়গা, কারখানা, শস্যাগার প্রভৃতি ছিল নগরের এই উঁচু দিকে। নিচু দিকে থাকত সাধারণ মানুষরা। তাদের ঘরবাড়িও ছিল অন্যরকম। বন্যা প্রভৃতি হলে নিচু দিকের মানুষরা ওপরদিকে গিয়ে আশ্রয় নিত।

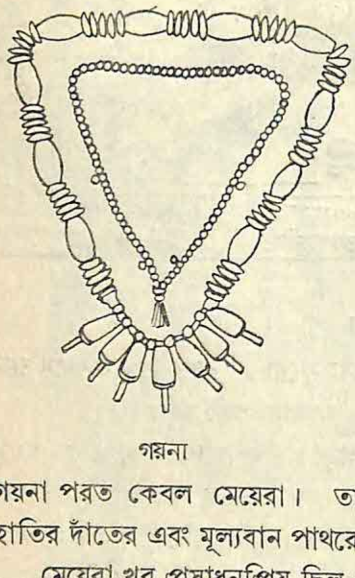
নগরের প্রশাসন সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যায় নি। অনেকেই মনে করেন, নগর প্রশাসনের জন্য কোন সমিতি বা সভা ছিল। জনস্বাস্থ্য এবং নগরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা এই সমিতি করত।

খাদ্য-বস্ত্র, তৈজসপত্র ঃ মহেঞ্জোদড়োর মানুষদের প্রধান খাদ্য ছিল যব আর গম। তারা শাকসবজি দুধ ফল মাছ মাংসও খেত। ভেড়া-ছাগল

শুয়োর-মুরগীর মাংস তাদের খুব প্রিয় ছিল। শুঁটকী মাছ, কচ্ছপের মাংস এমন কি গোমাংসেও তাদের কোন অরুচি ছিল না।

সিন্ধু উপত্যকার মানুষরা কাপাস তুলোয় বোনা কাপড় পরত। পশমের জামাকাপড়ও তারা ব্যবহার করত। তাদের তৈরী কোন কাপড় অবশ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা যায় নি। তবে তাদের তৈরী পুতুলের পোশাক দেখে ধারণা করা যায় যে, তারা কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একখণ্ড এবং দেহের ওপরের অংশের জন্য আর একখণ্ড কাপড় পরত।

দৈনন্দিন কাজের জন্য তারা তামা ব্রোঞ্জ রূপোর বাসনকোসন ব্যবহার করত। রান্না করত মাটির এবং তামার হাঁড়িতে। তারা চিনেমাটির তৈরী জিনিসও ব্যবহার করত। থালা বাটি গেলাস ক্ষুর কাস্তে এমন কি তাদের ব্যবহার করা মাছ ধরার বড়শীও পাওয়া গেছে। শোবার জন্য তাদের চারপায়া খাট ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলার জন্য তারা মাটি দিয়ে ঝুমঝুমি, টিয়া পাখি, ছোট ছোট চৌকি, ছোট খেলনাগাড়ি তৈরি করত।


গয়না

এখানকার মানুষরা গোরু মোষ ভেড়া উট হাতি কুকুর প্রভৃতি পুষত। ঘোড়া তাদের ছিল না।

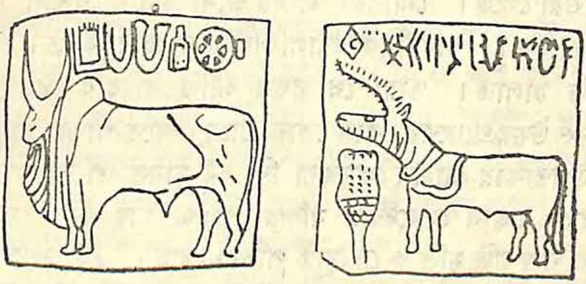
এখানকার ছেলেমেয়েরা সকলেই লম্বা চুল রাখত। কমবেশি গয়নাও তারা পরত। হাতের গলার কোমরের নানান গয়না ছিল। নাকে ও কানে গয়না পরত কেবল মেয়েরা। তাদের গয়না ছিল সোনার, রূপোর, তামার। হাতির দাঁতের এবং মূল্যবান পাথরের গয়নাও তাদের ছিল।

মেয়েরা খুব প্রসাধনপ্রিয় ছিল। তারা নানা সাজে সাজত। নানা ভাবে কেশবিন্যাস করত। চুল বাঁধবার সব রকম সাজসরঞ্জাম তাদের ছিল। আয়না-চিরুনি চুলের কাঁটা সব ছিল। প্রসাধন দ্রব্যও তারা ব্যবহার করত।

এখানকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল তামা আর ব্রোঞ্জের তৈরী। যুদ্ধের অস্ত্র ছিল বর্শা, তরোয়াল, তীরধনুক, কুড়ুল, ছুরি প্রভৃতি। লোহা তাদের সময়ে ছিল না। লোহা তখন আবিষ্কারই হয় নি।

এখানকার লোকেরা লেখাপড়া জানত। শিক্ষিত না হলে এত বড়

একটা উচ্চ সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হত না। তাদের ব্যবহার করা সীলমোহর থেকে তাদের লেখাপড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সীলমোহরের ওপর চিত্রলিপি খোদাই করা আছে। এখন পর্যন্ত ৩৯৬টি পৃথক চিহ্ন বা



সীলমোহর

অক্ষর সীলমোহরের ওপর পাওয়া গেছে। এতে কি লেখা আছে এখন পর্যন্ত পণ্ডিতরা তা পড়তে পারেন নি। লেখাগুলো যেদিন পণ্ডিতরা পড়তে পারবেন সেদিন মহেঞ্জোদড়োর কথা আরও অনেক বেশি জানা যাবে। সীলমোহরগুলো পাথর, পোড়ামাটি ও হাতির দাঁতের তৈরী।

শিল্প-বাণিজ্য, ধর্মাচরণঃ মহেঞ্জোদড়োর লোকেরা সেই প্রাচীনকালেই স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি নানা শিল্পে উন্নতি করেছিল। তামা ও ব্রোঞ্জের কাজ তারা করত। তাদের তৈরী মাটির কাজ, যেমন পুতুল, পাত্র প্রভৃতি খুব সুন্দর ছিল। পোড়ামাটি, পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির উপর তারা জীবজন্তুর অনেক মূর্তি খোদাই করত। এইগুলো ধ্বংসস্তূপের ভেতরে পাওয়া গেছে। সোনার ওপর খোদাইয়ের কাজ তারা জানত।

এই সমস্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার অভাব ছিল না। তাদের তৈরী একটি নর্তকীমূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মূর্তি থেকে তাদের উচ্চ শিল্পরুচির পরিচয় মেলে।

ব্যবসাবাণিজ্যেও তারা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। শহরের রাস্তার দু ধারে নানান দোকান ছিল। দোকানে খাদ্য, পানীয় সব কিছুই বিক্রি করা হত। রাস্তার পাশের একটি ঘরের কাছে মাটির অনেক ছোট ছোট ভাঁড় দেখা গেছে। হয়তো এটি একটি কোন পানীয় দ্রব্যের দোকান ছিল। মানুষ মরে গেছে কিন্তু তাদের ব্যবহার করা পাত্রগুলো এখনও মহেঞ্জোদড়োর রাস্তার ধারে পড়ে আছে।

বিদেশের সঙ্গে বিশেষত সুমের, মিশরের সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য চলত। মিশর ও সুমেরের তৈরী জিনিস যেমন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে, তেমনি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর তৈরী জিনিস ও সীলমোহর সুমেরে ও মিশরে পাওয়া গেছে। নৌবিদ্যা তাদের জানা ছিল। ব্যবসা করত তারা জলপথে জাহাজে। তারা চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করত। বলদ দিয়ে তারা গাড়ি চালাত। তারা যে রকম গাড়ি ব্যবহার করত সেই রকমের গাড়ি এখনও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন লোকেরা কি ধর্ম মানত তা সঠিক জানা যায় নি। এখানে কোন দেবদেবীর মন্দির পাওয়া যায় নি। তবে তাদের সীলমোহরে পশুপতি মূর্তি ও দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। এই থেকে ধরে নেওয়া



পশুপতি মূর্তি

হয়েছে যে তারা শিব ও দুর্গার পূজা করত। তারা গাছ বিশেষভাবে অশত্থ গাছ, কোন কোন পশু যেমন হাতি, ষাঁড় ও সাপের পূজা করত। তাদের মধ্যে শিবলিঙ্গের পূজা হয়তো প্রচলিত ছিল, কেননা সেখানে শিব-লিঙ্গের মত অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে। তাদের এই পূজা থেকেই পরে

ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গ পূজার প্রচলন হয় বলে অনেকে মনে করে। মৃতদেহ সৎকার করাও ধর্মের অঙ্গ ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে মৃতদেহ দাহ করা হত। কোন কোন অবস্থায় সমাধি দেওয়ারও রীতি ছিল। দেহাস্থি মাটির পাত্রে করে পুঁতে রাখা হত।

সামাজিক অবস্থা ঃ সিন্ধু সভ্যতার সব কথা জানা যায় নি। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে এখানে যে এক উচ্চ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সকল পণ্ডিতই একমত। প্রাচীন সভ্যতার জন্য মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রসিদ্ধ কিন্তু সিন্ধু সভ্যতাও যে তাদের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানকার মানুষ সমৃদ্ধ নাগরিক জীবন যাপন করত।

এই অঞ্চলের লোকদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তাদের সমাজেও বড়লোক গরীবলোক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদড়ো নগরটি ছিল দুই অংশে গঠিত। এর ওপর দিক বা উঁচু অংশটা ভাল। এখানে থাকত বড় লোকেরা, তাদের ঘরবাড়ি ভাল ছিল। তারা ভাল জামাকাপড় পরত। তারেদ মেয়েরা সোনা, রূপো, হীরে জহরতের গয়না পরত। শস্যভাণ্ডার, আমোপ্রমোদ পূজাঅর্চনার ব্যবস্থা তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। নগরের নিচের দিকের অংশে বাস করত সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। ছোট গলিতে ছোট ঘরে তারা থাকত। পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করত। হরপ্পার বিরাট শস্যাগারের কাছেই মজুরদের থাকার খুপরি ঘর ছিল। অন্য কোন রকম শ্রেণীবিভাগ তাদের সমাজে ছিল না কিন্তু ধনী-দরিদ্রের চিরকালের বিরোধ পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিল।

কিভাবে কখন যে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তার ইতিহাস কেউ জানে নি। এই সভ্যতার বিলোপের নানা কারণ পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন। এর মধ্যে একটি হল বাইরের কোন প্রবল শত্রুর আক্রমণ। দ্বিতীয়টি হল প্রবল জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভূমিকম্পের মত কোন দৈব দুর্ঘটনা।

রান্নাঘরে, স্নানের ঘরে কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সিন্ধু সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(খ) মহেঞ্জোদড়োর নগর-পরিকল্পনা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(গ) সিন্ধু সভ্যতা বলতে কি বোঝ? এই সভ্যতার যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(ঘ) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাচীন সভ্যতার কি কি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে? তা থেকে কি প্রমাণিত হয়?
(ঙ) মহেঞ্জোদড়োর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(চ) সিন্ধু সভ্যতার সময়ে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সিন্ধু সভ্যতা কোন সময় আবিষ্কার করা হয়?
(খ) কে কি ভাবে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করেন?
(গ) মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ কি?
(ঘ) এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয় কেন?
(ঙ) সিন্ধু সভ্যতার যুগে কিরূপ ব্যবসাবাণিজ্য চলত?

৩। এককথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) সার জন মারশাল কে ছিলেন?
(খ) মহেঞ্জোদড়োর অস্ত্রশস্ত্র কি দিয়ে তৈরি ছিল?
(গ) মহেঞ্জোদড়োর লোক কার পূজা করত?
(ঘ) মহেঞ্জোদড়ো নগরটি কয় অংশে গঠিত ছিল?

৪। নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং যেটি ভুল তার পাশে কাটা চিহ্ন (×) দাও ঃ

(ক) মহেঞ্জোদড়ো নগর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল।
(খ) মহেঞ্জোদড়োর ছেলেমেয়েরা লম্বা চুল রাখত।
(গ) মহেঞ্জোদড়োতে মৃতদেহ দাহ করা হত না।
(ঘ) মহেঞ্জোদড়োর লোকেরা লেখাপড়া জানত না।

৫। টীকা লেখ ঃ

(ক) জন মারশাল, (খ) দয়ারাম সাহনী, (গ) সীলমোহর, (ঘ) হরপ্পা।

৬। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল — আর —।
(খ) তাদের — হতে তাদের লেখাপড়ার পরিচয় পাওয়া যায়।
(গ) মহেঞ্জোদড়ো নগরটি ছিল — অংশে বিভক্ত।
(ঘ) হরপ্পার বিরাট শস্যাগারের কাছেই — থাকার — ঘর ছিল।
(ঙ) সিন্ধু সভ্যতা প্রায় — হাজার বছরের পুরোনো।

৭। নির্দেশ ঃ

তোমরা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত নানা জিনিসের ছবি এঁকে তোমাদের খাতায় গাঁথ এবং কিসের ছবি তার তলায় লেখ।

৪। চীন

- হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদী-উপত্যকা
- চীনের লোককাহিনী

প্রাচীন চীনঃ হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদী-উপত্যকাঃ চীনের আদি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল হোয়াং-হো আর ইয়াং-সি-কিয়াং নদী উপত্যকা ঘিরে। হোয়াং-হো নদীর আর একটা নাম হল পীত নদী। জলের হলদেটে রঙ থেকে এই নাম হয়। এই নদীতে বছর বছর বান আসত, নদীর গতিপথ বদলে যেত, তাই এই নদীর কিনারা ছেড়ে অনেক মানুষ সরে গিয়ে মধ্য চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতটে বসবাস শুরু করে। মধ্য চীনের এই অঞ্চলও উচ্চ চীনের পীত নদীতটের মতই উর্বর ছিল। এখানেও ভাল কৃষিকাজ হত।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনে যে মানুষ ছিল সে কথা আগের এক অধ্যায়ে আমরা পড়েছি। চীনের 'পিকিং মানব' অন্তত তিন লক্ষ বছর আগে জীবিত ছিল।

পুরানো দিনের চীনের কথা জানা যায় কিছু গল্প, উপকথা আর লোক-কাহিনী হতে। এসব কাহিনীর সবটাই ঠিক ইতিহাস নয়।

পাঁচ হাজার বছরেরও আগে মধ্য এশিয়ার একদল মানুষ পশ্চিম দিক দিয়ে চীনে প্রবেশ করে। হোয়াং-হো নদীর ধারে তারা বাস করতে থাকে। চীন উপকথায় বলা হয়েছে এরা ছিল অর্ধসভ্য ; এরা ছিল পীত জাতি। এই মানুষরা কৃষিকাজ জানত। গোরু ভেড়া শুয়োর হাঁস মুরগী পুষত। মাটি দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করত, ছাউনি দিত বাঁশের। সমাজবদ্ধ হয়ে এরা বাস করত। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই চীনের নানা জায়গায় এরা ছড়িয়ে পড়ে। এরা গ্রাম গঠন করে। একসময় এই সব গ্রামগুলি নিয়ে ক্রমে এদের রাজ্য গঠিত হয়। এইভাবে চীনে অসংখ্য স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছ'শ বছর আগেও চীনে পাঁচ ছ' হাজার ছোট ছোট রাজ্য ছিল।

এই রকম এক রাজ্যের রাজা 'উ' প্রায় চার হাজার বছর আগে অনেক-গুলি ছোট রাজ্য নিজের অধিকারে এনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 'উ' যে রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন তার নাম 'শি' বংশ। তাঁর বংশের লোকেরা চারশ বছর রাজত্ব করেন। তারপর 'শি' বংশের পতন ঘটিয়ে চীনের সম্রাট হলেন ইন বা শাং বংশের রাজা। শাং বংশের কথা পরে আলোচনা করা হবে।

চীনের লোককাহিনী ঃ প্রাচীন সব দেশেরই অনেক উপকথা, লোককাহিনী আছে। আমাদের দেশেও বহু গল্প আছে। আমরা সেগুলোকে পুরাণের গল্প বলি। চীনেও এমন অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাদের একটি কাহিনীতে বলা হয় যে, আগে পৃথিবীতে সূর্য আকাশ বায়ু কিছুই ছিল না। ছিলেন কেবল পানকু। তিনি আঠারো হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর চোখের জল দিয়ে পৃথিবী ও সূর্য সৃষ্টি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মাথা থেকে পাহাড় পর্বত জন্ম নেয়। তাঁর শ্বাস থেকে হয় বায়ু। মানুষ ও অন্য জীবজন্তু জন্মে তাঁর গায়ের উকুন থেকে। 5 A

অন্য এক গল্পে বলা হয় যে, আগে পাঁচ জন রাজা চীনে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা চীনের মানুষদের সকল রকম কাজ শেখান। তার আগে চীনের মানুষ কিছু জানত না। রাজাদের একজন শেখান গুটিপোকা পালন করতে, রেশমের কাপড় বুনতে। এক রাজা শিখিয়েছিলেন লেখাপড়া। অপর একজন বন্যানিয়ন্ত্রণ করে চীনে চাষবাসের উন্নতি করেন। এর জন্য তাঁকে নটা পাহাড় ফুটো করে নটা হ্রদ তৈরি করতে হয়েছিল।

বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গল্পে কিছুটা সত্য আছে। কেন না সম্রাট হয়ে 'উ, বন্যা-প্রতিরোধের জন্য নদীতে বাঁধ বেঁধেছিলেন। বাঁধের জল কৃষিজমিতে নেবার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

চীনের মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই লেখাপড়ার চর্চা করত। চীনের অক্ষরকে বলা হয় চিত্রলিপি। চিত্র বা ছবি এঁকে তারা এক-একটি জিনিস বোঝাত। প্রত্যেকটি শব্দের জন্য আলাদা ছবি ছিল। কাজেই ছবির সংখ্যা ছিল অসংখ্য। যে যত বেশি ছবি বা শব্দ জানত সে তত বেশি বিদ্বান ছিল। চীনের চিত্রলিপি মিশরের চিত্রলিপি থেকে পৃথক।

চীনের চিত্রলিপিতে লেখাপড়া করা বড় কঠিন। লেখবার জন্য চীনের লোক এখনও চারশ ছবি ব্যবহার করে থাকে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) চীনের প্রাচীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল ?

(খ) চীন দেশে বন্যা আনত কোন নদী ? কে এই বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন ?

(গ) পানকু কে ? পানকুর বিষয় কিংবদন্তী থেকে চীন দেশ সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) চীনের দুঃখের নদ কোনটি এবং কেন ?
(খ) পানকু সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(গ) প্রাচীন চীনের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ?
(ঘ) চীনা লিপি সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(ঙ) পুরানো দিনের চীনের কথা কি থেকে জানা যায় লেখ।
(চ) পীত জাতির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) চীনে —— ও —— নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে।
(খ) প্রাচীন চীনের মানুষেরা ছিল —— ও ——।
(গ) চীনের — নদীর বন্যা মানুষের দুঃখ আনত।
(ঘ) প্রাচীন চীনে —— যন্ত্র ব্যবহার করা হত।
(ঙ) —— রাজা চীনের বন্যা প্রতিরোধ করেন।
(চ) চীন উপকথায় বলা হয়েছে পীত জাতি ছিল ——।
(ছ) উ যে রাজ্য স্থাপন করেন তার নাম —— বংশ।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) চীন দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত ?
(খ) চীনের কোন নদীতে প্রতি বছর বন্যা আসত ?
(গ) প্রাচীন চীনের অধিবাসীরা কোন্ দেব দেবীকে বিশ্বাস করত ?
(ঘ) তারা পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে কি মনে করত ?
(ঙ) চীনের কোন রাজা বন্যা প্রতিরোধ করেন ?
(চ) হোয়াং-হো নদীর অপর নাম কি ?

৫। **টীকা লেখ ঃ** পানকু, সম্রাট উ, চীনের লিপি।

৬। **কোনটি সঠিক উত্তর দাও ঃ**

(ক) চীনের পিকিং মানব অন্ততঃ (পাঁচ লক্ষ/তিন লক্ষ) বছর আগে জীবিত ছিল।
(খ) চীনের মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই লেখাপড়ার (চর্চা করত/চর্চা করত না)।
(গ) চীনের অক্ষরকে বলা হয় (শিলালিপি/চিত্রলিপি)।

৫। নদী-উপত্যকার সভ্যতার রূপরেখা

- নদী-উপত্যকার সভ্যতার বৈশিষ্ট্য
- আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

নদী-উপত্যকার সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাচীন পৃথিবীর সব কয়টি সভ্যতারই সৃষ্টি হয়েছিল নদীতীরে। মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরের সভ্যতা, মিশরের নীল নদের তীরে মিশরের সভ্যতা, সিন্ধু নদের অববাহিকায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। চীনে আদি সভ্যতার জন্ম হয় হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর অঞ্চল ঘিরে।

আদিম যাযাবর মানুষরা বসবাসের জন্য কেন নদীতীর বেছে নিয়েছিল সে কথা আগে তোমরা পড়েছ। মানুষ নদীতীরে ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করত জলের জন্য। জল না হলে যেমন মানুষের প্রাণ, গৃহপালিত পশুর প্রাণ বাঁচে না, তেমনি জল না হলে কৃষিকাজও হয় না। কৃষিকাজ না হলে খাদ্য পাওয়া যায় না। মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিল, বড় বড় নদীর জল কখনো ফুরোয় না। যত খুশী খরচ করা চলে। নদীর ওপর দিয়ে নৌকো করে তাড়াতাড়ি দূর দেশে যাওয়া যায়। নদীর মাছও খাওয়া যায়। এই সব সুযোগ-সুবিধার জন্য মানুষ নদীর তীর বেছে নেয় বসবাসের জন্য।

তারা প্রথম ঘরবাড়ি গড়ে। আস্তে আস্তে কয়েকটি ঘরবাড়ি মিলে গ্রাম হয়, গ্রাম বড় হয়ে হল শহর আর নগর। রাজ্য গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

সকল দেশের সভ্যতার মূলে ছিল কৃষিসম্পদ। যে যত বেশি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করত, সে তত তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারত। সুমেরের লোকেরা কৃষিকাজ করে উন্নতি করে, মিশরের সভ্যতার ভিত্তিও ছিল নীল নদের তীরের প্রচুর ফসল। সিন্ধু নদের অববাহিকাও কৃষিকাজের উপযোগী ছিল। চীনেরও তাই।

নদীতীরের সব সভ্য দেশের মানুষরা তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করত ইট দিয়ে। ইট তৈরির কাদামাটি নদীতীরে প্রচুর ছিল। সুমেরের সুবৃহৎ মন্দিরগুলি ছিল ইটের তৈরি। মহেঞ্জোদড়োর গোটা নগরটাই ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। মিশরের লোক মন্দির ও বাড়ি তৈরি করতে পাথর ব্যবহার করেছিল এই জন্য যে, তাদের জীবন নির্ভর করত একমাত্র নীল নদের জলকে

ব্যবহার করে। মাটিকে ইট তৈরির কাজে লাগালে সেখানে আর অন্য কিছু হত না। তাই তাদের না খেয়ে মরতে হত। তা ছাড়া তারা দেখেছিল ইটের চাইতে পাথর দীর্ঘস্থায়ী। চীনেও ইন রাজাদের ঢিপিতে ইটের দেখা পাওয়া গেছে।

কৃষিকাজের জন্য জল দরকার। সারা বছর যাতে জল পাওয়া যায় তার জন্য বন্যার বাড়তি জল ধরে রেখে কৃষিকাজে লাগান হয়। নদীতে এজন্য বাঁধ বাঁধা হয়। সুমেরের মানুষ ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। তারা তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীতে প্রথম বাঁধ বাঁধে। পরে বাঁধ থেকে খাল কেটে চাষের জমিতে জল নেয়। মিশরের লোকেরাও নীল নদে বাঁধ দিয়েছিল। অসংখ্য খাল কেটে খেতখামারে জল নেবার ব্যবস্থা করেছিল। চীনেও নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল আদিকালেই। এর জন্য 'নটা পাহাড় ফুটো করে নটা হ্রদ' তৈরি করা হয়েছিল। ফলে সেখানে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও চাষের জলের ব্যবস্থা দুইই হয়েছিল। সিন্ধু উপত্যকায় কোন প্রাচীন বাঁধ আবিষ্কৃত হয় নি। কারণ, ভারতে প্রচুর বৃষ্টি হত, কৃষির জন্য জলের অভাব হত না। তাই হয়তো সিন্ধু উপত্যকার মানুষ নদীতে বাঁধ দিত না। সিন্ধুর ভাটির দিকে বন্যাও কম হত।

নদীর ধারে বসবাসকারী সব দেশের মানুষরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। জলপথে ব্যবসাবাণিজ্য করতে দূর দূর দেশে তারা যেত। ব্যবসাবাণিজ্য করে তারা আর্থিক উন্নতিও করেছিল।

ধর্মকর্মও সকল দেশে প্রায় একই রকমের ছিল। সকল দেশেই বহু দেবদেবী ছিলেন। সব দেশেই দেবতার জন্য মন্দির ছিল। সুমেরের লোকেরা দেবতার জন্য সুবৃহৎ মন্দির তৈরি করেছিল। মিশরেও অসংখ্য দেবমন্দির ছিল। মন্দিরে পূজার জন্য পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতরা কেবল ধর্মকর্ম নিয়েই থাকতেন না। তাঁরা দেশ শাসনও করতেন। মেসোপটেমিয়ায় মিশরে চীনে পুরোহিতরা ছিলেন সমাজের প্রথম শ্রেণীর মানুষ। সিন্ধু উপত্যকায় অবশ্য পুরোহিত বা মন্দিরের খোঁজ মেলে নি। তবে সেখানকার লোকেরা ধর্ম উপাসনা করত। নানা দেবদেবী এবং প্রকৃতির পূজা করত।

নদীতীরবর্তী সভ্য সমাজের মধ্যে তখনকার দিনে সরাসরি যোগাযোগ কমই ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের সভ্যতা প্রায় একই ধাঁচে গড়ে উঠেছিল। নিজেদের চেষ্টায় তারা মাটির পাত্র তৈরি, ধাতুর কজ, চাকা তৈরি ও তার ব্যবহার শিখেছিল।

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ঃ শহর ও নগরের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষের কাজও বাড়ল। শহরের প্রয়োজনে গ্রামের কৃষিনির্ভর মানুষকে অনেক নতুন কাজ ও বৃত্তি শিখতে হল। প্রথমেই দরকার হল, বাড়ি তৈরির জন্য ইট তৈরি করার লোকের। একদল মানুষ ইট ও বাড়ি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতে শিখল। এইভাবে শিল্পী, কারিগর, দোকানদার, মজুর—নানা শ্রেণীর লোক সমাজে এল। বিভিন্ন বৃত্তির কাজ করে তারা জীবিকা অর্জন করত। সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ হল। বৃত্তি হয়ে গেল বংশগত। আয়ের পরিমাণ কমবেশি হওয়াতে আর্থিক দিক থেকেও সমাজ দু'ভাগ হল। যাদের পয়সা বেশি হল তারা হল বড়লোক। এই শ্রেণীতে রইল অভিজাতরা, পুরোহিতরা, বিত্তবানরা। সাধারণ মানুষ যাদের পয়সা কম তারা হল গরীব শ্রেণীর। মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় আর এক শ্রেণীর মানুষও ছিল। তাদের বলা হত দাস। শুধু কাজ করার জন্যই তাদের রাখা হত। তাদের মানুষ বলেই স্বীকার করা হত না। সমাজের শ্রেণীবিভাগ ও আর্থিক তারতম্য প্রাচীন সব সভ্য সমাজেই ছিল। সুমেরে মিশরে চীনে সিন্ধু নদের তীরে, সব জায়গাতেই এক অবস্থা ছিল। গরীবরা ছিল নিচে। বড়লোকরা সমাজের সবরকম সুযোগসুবিধা ভোগ করত। দাসদের সবচাইতে খারাপ অবস্থা ছিল মিশরে। চীন আর ভারতে দাসপ্রথা ছিল না।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কেন নদী-উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?
(খ) নদী-উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠলে সমাজে কি কি পরিবর্তন আসে ?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) পৃথিবীর কোন কোন নদীতীরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে ?
(খ) নদী-উপত্যকার মানুষ নদীর জলকে কোন্ কোন্ কাজে লাগাত ?
(গ) সম্পদ কিভাবে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে জমা হল ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**
শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) কৃষিকাজ শুরু হবার পর মানুষ শিখল —।
(খ) চীনের — রাজাদের ঢিপিতে ইট পাওয়া গিয়েছে।
(গ) দাসদের সব চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল —।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাচীনকালে কোন নদীতীরে কোন সভ্যতা গড়ে ওঠে ?
(খ) কোন কোন প্রাচীন সভ্য দেশে দাসপ্রথা অধিক প্রচলিত ছিল ?

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগ : লৌহযুগের সমাজ

- লোহা আবিষ্কার, ব্যবহার, সমাজে লোহার প্রভাব
- রাজপদের উৎপত্তি

লোহা আবিষ্কার, লোহার ব্যবহার, সমাজে লোহার প্রভাব : লোহা কখন কোথায় কে আবিষ্কার করেছিলেন তার কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তামা আবিষ্কারের মতোই মানুষ এক সময় লোহা আবিষ্কার করে। আসেরিয়ার রাজা দ্বিতীয় সারগন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রথম লোহার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিলেন।

লোহার আবিষ্কার ও তার ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে এখনও পুরোদমে চলছে। আমাদের বর্তমান সভ্যতাও লৌহ যুগের সভ্যতা। আমাদের চার পাশেই লোহা, লোহা ভিন্ন আমাদের একদিনও চলে না। লোহা আবিষ্কারের পর তাম্র যুগের অবসান ঘটল।

তামা পাওয়া যেত কম। তাই তামার ব্যবহার ছিল সীমিত। তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ছিল মাত্র কয়েকজন বড় বড় সম্রাটের। কৃষির কাজে তামার যন্ত্রপাতি কৃষকেরা কমই ব্যবহার করতে পারত।

লোহা হল সুলভ। লোহা পাওয়া যেত প্রচুর। লোহার যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র সাধারণ অবস্থার মানুষও কিনতে পারত ও ব্যবহার করতে পারত। বহু মানুষ লোহার কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেল। তাদের হাতে অর্থ আসায় ধীরে ধীরে সমাজেও অনেক পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

বেশি পাওয়া যেত এবং তৈরী জিনিস শক্ত হত বলে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র লোহার হত। বেশি হাতিয়ার পেয়ে বেশি মানুষ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। অনেক নতুন জাতি-উপজাতি লোহার অস্ত্র পেয়ে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল। তাদের আক্রমণে পরবর্তীকালে বহু সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

লোহা আবিষ্কারের ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নতুন যুগের সূচনা হল।

রাজপদের উৎপত্তি : আদিম রাষ্ট্র কি করে উদ্ভব হয়েছিল সে কথা তোমরা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের অধ্যায়ে পড়েছ।

রীতিনীতি নিয়মশৃঙ্খলা সকলে ঠিক মত মেনে চলছে কিনা তা দেখবার ভার পড়ল এমন একজন মানুষের ওপর যিনি ছিলেন শক্তিশালী বিবেচক ও

বুদ্ধিমান। সকলে তাঁকে মান্য করে চলত, ভয় করত, ভক্তিশ্রদ্ধাও করত। তিনি হয়ে উঠলেন সকলের বড় ও ক্ষমতাবান। তাঁর লোকবল বাড়ল, ভাল ঘরবাড়ি হল। ক্রমে এই ব্যক্তি হলেন দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা রাজা।

মানুষরা গোষ্ঠীগতভাবে বাস করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে নেতা থাকত। ভারতের আর্যরা তাদের নেতাকে বলত 'রাজন্'। রাজন্ কথার অর্থও রাজা। গোষ্ঠীপ্রাধান্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে রাজা ছিলেন। গ্রীসে রাষ্ট্রও ছিল অসংখ্য।

রাজপদ প্রথমে বংশগত ছিল না। একজন রাজার মৃত্যুর পর লোকেরা অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করত। পরে রাজপদ বংশগত হয়। রাজার ছেলে রাজা হতে থাকে। রাজপদ যে ভগবদ্-দত্ত এই আদর্শও ক্রমশঃ গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) লোহা আবিষ্কারের পর সমাজ জীবনের পরিবর্তনের বিষয় যা জান লেখ।
(খ) সমাজে রাজপদের প্রবর্তন হল কি করে আলোচনা কর।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোন রাজা সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্রে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সাজান ?
(খ) 'রাজন্' কথার অর্থ কি ? প্রাচীন কালের লোক দেশের রাজাকে কিরূপ চোখে দেখত ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) আমাদের বর্তমান সভ্যতা — যুগের সভ্যতা।
(খ) তামা কম পাওয়া যেত, তাই তামার ব্যবহার ছিল —।
(গ) লোহা হল সুলভ, তাই লোহার ব্যবহার হল —।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) লোহা আবিষ্কার করে কারা ?
(খ) প্রথম লোহার ব্যবহার করে কোন রাজা ?
(গ) লোহা আবিষ্কার হওয়ায় প্রাচীন মানুষ কিসে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল ?

১ (ক) ব্যাবিলন

- কৃষিকাজ ঃ ব্যবসাবাণিজ্য
- মন্দির ঃ পুরোহিত ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি
- হাম্মুরাবির আইন ঃ সমাজচিত্র

কৃষিকাজ ঃ ব্যবসাবাণিজ্য ঃ তোমরা ব্যাবিলনের নাম নিশ্চয় শুনেছ। পৃথিবীর আটটি আশ্চর্য বস্তুর একটি 'শূন্য উদ্যান' ছিল ব্যাবিলনে। ব্যাবিলন ছিল মেসোপটেমিয়ায়। এখানকার ইরাকের বাগদাদ শহর থেকে এর দূরত্ব ছিল দক্ষিণে ষাট মাইলের (সাড়ে ছিয়ানব্বুই কিলোমিটার) মত। একশ বছর আগের মানুষও ব্যাবিলনের কথা জানত না। সবই ছিল মাটির নিচে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ব্যাবিলন আবিষ্কার করেছেন।

সুমেরের কথা আগেই পড়েছ। সুমেরের যখন বাড়বাড়ন্ত অবস্থা তখন মেসোপটেমিয়ার পশ্চিমদিকের মরু অঞ্চল থেকে একদল উপজাতীয় লোক এসে সুমের রাজ্যের ইউফ্রেতিস নদীর ধারে ব্যাবিলন নামে ছোট্ট একটি গ্রামে বসবাস করতে থাকে। এরা যখন প্রথম আসে তখন জায়গাটা ছিল জলাজঙ্গলে ভরতি। কিন্তু মানুষগুলো ছিল পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং উৎসাহী। তাদের পরিশ্রম ও উৎসাহে ব্যাবিলন ক্রমশ উন্নত হতে থাকে।

ব্যাবিলনে বাস করত বলে এখানকার মানুষদের বলা হত ব্যাবিলনীয়। পরে এখানে যে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে তার নাম হয় ব্যাবিলনের সাম্রাজ্য।

ব্যাবিলন গ্রাম ক্রমশ উন্নত হয়ে বড় শহর হয়। শহর নানাদিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে একটি রাজ্য। এই রাজ্য পরে সমগ্র মেসোপটেমিয়া অধিকার করে। গড়ে ওঠে এক সাম্রাজ্য। সুমের জয় করলেও ব্যাবিলনীয়রা কেউ সুমেরের সভ্যতা ভাষা সংস্কৃতি নষ্ট করল না। তারা নিজেরাই বরং সুমেরের ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা গ্রহণ করল। সাম্রাজ্যের আমলে ব্যাবিলন সম্পদে ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর হয়ে ওঠে। সৌধে মন্দিরে নগর শোভা পায়।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলনের খ্যাতি ও গরিমা বর্ণনা করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, ব্যাবিলন শহরের চারদিকে ইটের দেওয়াল দেওয়া ছিল। শহরটি যে বড় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ব্যাবিলনের সম্রাটদের মধ্যে হামুরাবি ছিলেন প্রসিদ্ধ। সম্রাট হামুরাবির

কথা পরে বলা হবে। ব্যাবিলনীয়দের পরে এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করে আসিরিয়ানরা। তাদের পরাজিত করে ব্যাবিলন অধিকার করেন পারস্যরাজ সাইরাস। পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয় গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার। এর পর আসে মোঙ্গলরা, তুরকীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেসোপটেমিয়া আবার স্বাধীন হয়। তখন থেকে তার নাম হয় ইরাক।

মেসোপটেমিয়ার যে অংশে প্রাচীন ব্যাবিলন ছিল সে অঞ্চল খুবই উর্বর ছিল। ব্যাবিলনের মানুষরা পরিশ্রম করে তার আরও উন্নতি করে। তারা নদীতে বাঁধ বাঁধে, নালা খাল কেটে ফসলের মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করে। কৃষিকাজের ফলে তাদের মাঠে ফসল হতে থাকে প্রচুর। তারা ধান গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। অনেক রকমের ফলের চাষ করত। ফসলের জমির ধারে ধারে ফলের গাছ পুঁতে দিত। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। তারা ছিল সম্পন্ন কৃষক।

ব্যাবিলন অবস্থিত ছিল এশিয়া আফরিকা ও ইউরোপ থেকে আসা-যাওয়ার পথের ধারে। এখানে তাই ব্যবসাবাণিজ্যের বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যাবিলনের শিল্পীরা, কারিগররা সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করে বিক্রির জন্য বাজারে আনত। বিভিন্ন দেশের বণিক ব্যাবিলনের বাজারে আসত বেচাকেনার জন্য। নানা দেশের নানা জিনিসে বাজার থাকত জমজমাট। দেশের শাসনব্যবস্থা ছিল ভাল, রাস্তাঘাট ছিল নিরাপদ। দূর দূর দেশের ব্যাপারীরা উটের পিঠে গাধার পিঠে মাল বোঝাই করে ব্যাবিলনের বাজারে আসত। এখানে দেখা যেত আরব বণিকদের, ইউরোপের ব্যাপারীদের, এশিয়া মাইনর আর ভারতের ব্যবসায়ীদের। তখনকার দিনে ব্যাবিলন ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র।

মন্দির ঃ পুরোহিত ঃ ব্যাবিলনের লোকেরা অনেক নগর তৈরি করেছিল। সুমেরীয়দের তৈরী নগরেরও তারা উন্নতি করে। সুমের বাদে বড় নগর ছিল নিপ্পুর, উর প্রভৃতি। তবে ব্যাবিলন শহরের উন্নতির দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

ব্যাবিলনীয়দেরও প্রত্যেক শহরের জন্য আলাদা দেবতা ছিল। উর শহরের দেবতা ছিলেন নান্নর। তিনি ছিলেন চন্দ্রদেবতা। চন্দ্রদেবতার মন্দিরটি ছিল পাকা ইটের তৈরী। ব্যাবিলন শহরের দেবতার নাম ছিল মারডাক। তিনি দেবতাদের দেবতা, দেবাদিদেব। এই দেবমন্দিরটির উচ্চতা ছিল নব্বুই মিটার বা তু'শ আটাশি ফুট। বহুতলবিশিষ্ট এই মন্দিরটি দেখতে ছিল ছোটখাট একটা পাহাড়ের মত। ওপর দিকটা চূড়াকৃতি করে

গড়া ছিল। উর, সুমের এবং অন্যান্য শহরেও বিরাট বিরাট মন্দির ছিল। তাদের একজন দেবতার নাম ছিল শামাস। তিনি সূর্যের দেবতা। প্রেমের দেবীর নাম ছিল ইসতার। সুমেরীয়দের মত ব্যাবিলনের মানুষও মন্দিরকে বলত জিগুরাত।

ধর্মকর্ম ব্যাবিলনের মানুষের জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। পূজার্চনার জন্য তাদের পুরোহিত ছিল। ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ তারা মন্দিরে দিত। মন্দিরের পুরোহিতরা পূজার্চনা বাদে স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও পরিচালনা করতেন। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ পুরোহিত।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ঃ মন্দিরের পুরোহিতরা পূজাপাঠ শাসনকাজ ছাড়া লেখা-পড়াও করতেন। প্রত্যেক জিগুরাতেই বিদ্যালয় ছিল। সকলেই এখানে পড়াশুনা করতে পারত। বড়লোকের ছেলে আর গরীবের ছেলের মধ্যে বিদ্যালয়ের কোন ফারাক ছিল না। বড় ঘরের ছেলের পাশে অনায়াসেই গরীবের ছেলে বসে পড়াশুনা করত। পুরোহিতরা ছাড়া মাইনে করা শিক্ষকও সেখানে ছিল।

ব্যাবিলনের লোকেরা সুমেরের ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। এই ভাষাকে উন্নত করে তারা গল্প কবিতাও লিখত। তারাও মাটির টালির ওপর কীলকাক্ষরে তাদের সাহিত্য রচনা করেছিল। ব্যাবিলনের বিজ্ঞানীরা জল-ঘড়ি আবিষ্কার করেন। জলের স্রোতে এই ঘড়ি চলত।

হামুরাবির আইন ঃ সমাজচিত্র ঃ ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তাঁকে বলা হয় দিগ্বিজয়ী বীর। তাঁর আমলে সমগ্র মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলনের অধীনে ছিল। হামুরাবি তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের জন্য নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন করেছিলেন। এই আইনগুলি তিনি একখানা কালো পাথরে খোদাই করে প্রধান মন্দিরের সামনে রেখেছিলেন। পাথরখানা আট ফুট (প্রায় আড়াই মিটার) উঁচু। জনসাধারণ সহজে তা দেখতে পেত। এই পাথরখানা এখনও আছে। এই আইনে শাসন বিষয়ের প্রায় সবকিছুই লেখা ছিল। তাই হামুরাবিকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম আইনপ্রণেতা। এতে আছে, সকলকেই আইন মানতে হবে। সরকারের কর্তব্য দোষীকে সাজা দেওয়া। সাজা দেওয়া হবে চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নিয়ে। ধনীদরিদ্র সকলের জন্যই আইন সমান কিন্তু অভিজাত আর পুরোহিতরা দোষ করলে তাঁদের সাজা পেতে হবে বেশি। কারণ তাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা আইন মেনে

চলবেন এটাই আশা করা যায়। কাজের বদলে দাসদের বেতন দিতে হবে। নারীরাও পুরুষের সমান অধিকার পাবে। প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে হবে। তবে জরিমানা দিলে রেহাই পাবে।



হামুরাবি ও সূর্যদেবতা

হামুরাবির আইনগুলি থেকে তখনকার সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল। ধনী, সাধারণ মানুষ ও দাস। ধনীদের মধ্যে ছিল অভিজাতরা এবং পুরোহিতরা। দাসরাও আইনের ন্যায়বিচার পেত। তারা কাজের বদলে মাইনে পেত। সেই টাকা তারা মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে মুক্ত হতে পারত। সাধারণ মানুষদের মধ্যে ছিল কৃষক, নানা ধরনের শিল্পী কারিগর। সমাজে নারীদের সম্মান ছিল, তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত। পুরুষের সমান তাদের অধিকার ছিল।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কৃষিকাজের উন্নতির জন্য ব্যাবিলনীয়রা কি কি ব্যবস্থা করেছিল তা সংক্ষেপে লেখ।

(খ) হাম্মুরাবিকে পৃথিবীর প্রথম আইনপ্রণেতা বলা হয় কেন ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(গ) ব্যাবিলনে পুরোহিতদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল কেন ? ফলে সমাজে কি পরিবর্তন হয়েছিল ?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ কারা কিভাবে আবিষ্কার করেন ? এর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় কর।

(খ) ব্যাবিলনীয়রা কারা ? তাদের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

(গ) ব্যাবিলন শহরের প্রধান দেবতার নাম কি ছিল ? আর কোন্ কোন্ দেবদেবীর পূজা তারা করত ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(১) **যে কথাটি ঠিক তার তলায় দাগ দাও ঃ**

(ক) ব্যাবিলন প্রথমে ছিল একটি ছোট (শহর/গ্রাম)।

(খ) (ব্যবসাবাণিজ্য/যুদ্ধ)-এর জন্য ব্যাবিলন বিখ্যাত ছিল।

(গ) ব্যাবিলনের লোকেরা ছিল (ধর্মভীরু/ধর্মবিশ্বাসী)।

(ঘ) ব্যাবিলনের সম্রাটদের মধ্যে (সারগন/হাম্মুরাবি) ছিলেন বিখ্যাত।

(ঙ) ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে নারী পুরুষের অধিকার ছিল (সমান/অসমান)।

(২) **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) ব্যাবিলন শহরের দেবতার নাম —।

(খ) ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা ছিলেন —।

(গ) তখনকার দিনে ব্যাবিলন ছিল — বাণিজ্যকেন্দ্র।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ব্যাবিলনের কোন জিনিসটি পৃথিবীর প্রাচীন সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম ?

(খ) কোন্ ঐতিহাসিক ব্যাবিলনের খ্যাতিগরিমার বর্ণনা করে গিয়েছেন ?

(গ) ব্যাবিলনের সম্রাটদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ?

(ঘ) নান্নর কোন্ শহরের কোন্ দেবতা ছিলেন ?

(ঙ) ব্যাবিলনীয়দের সূর্যদেবতার নাম কি ছিল ?

---

১ (খ) মিশরের সাম্রাজ্য

● সাম্রাজ্য ঃ উপনিবেশ
● পুরোহিতদের ক্ষমতা

সাম্রাজ্য ঃ উপনিবেশ ঃ মিশরের কথা আগের এক অধ্যায়ে কিছুটা বলা হয়েছে। মিশরের হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসকে বোঝবার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাঝামাঝি সময়ের রাজাদের আমলেই মিশরের সীমানা বাড়তে থাকে। মিশরের পুবে সিনাই অঞ্চল তখন মিশর জয় করে। দক্ষিণদিকের নুবিয়া মিশরের অধিকারে আসে। কিন্তু এর পর মিশর নিজেই অন্যের অধীন হয়। হিকসসরা মিশর অধিকার করে।

হিকসসরা মিশরে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করে। তাদের আমলেও মিশরের প্রসার হয়। উত্তরে মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস নদীর তীর পর্যন্ত হিকসসরা অধিকার করে। হিকসসদের শাসনকালে মিশরবাসীদের অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়। অবশেষে হিকসসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। হিকসসরা মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিশর আবার স্বাধীন হল।


তৃতীয় থুথমস

হিকসসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন থেবস শহরের দুইজন রাজকুমার। পরে তাঁদের একজন আহমোস মিশরের সম্রাট হন। রাজধানী হল থেবস শহরে। থেবস শহরের নাম এখন কায়রো। হিকসসরা মিশর ছেড়ে মেসোপটেমিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল। আহমোসের বংশের এক ফারাও প্রথম থুথমস হিকসসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইউফ্রেতিস নদীর কিনারা পর্যন্ত অধিকার করেন। থুথমসের পর মিশরের সিংহাসনে বসলেন একজন মহিলা। নাম হাতসেপুট। তিনিও সাম্রাজ্য অটুট রাখতে পেরেছিলেন। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই এবং স্বামী তৃতীয় থুথমস। মিশরে তখন ভাইবোনে বিয়ে হত। তিনি এশিয়া মাইনর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। প্যালেস্টাইন তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর শাসনকালে মিশর বিশেষ উন্নতি করে। তাঁর পরের কয়েকজন ফারাও যোগ্য সম্রাট ছিলেন। সাম্রাজ্য

তাঁরা অটুট রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রায় একশ বছর পরে যিনি সম্রাট হন তিনি ছিলেন ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া। তাঁর নাম আমেনথম। মিশরের লোক নানা ঠাকুরদেবতার পূজা করত। তিনি চাইলেন সকল দেবতার পূজা বন্ধ করে একমাত্র তাঁর উপাস্য দেবতা 'আটন' বা সূর্য দেবতার পূজা প্রচলন করতে। এই নিয়ে দেশের পুরোহিতদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে। ধর্মে বিশ্বাসী দেশের লোকদের পুরোহিতরা ক্ষেপিয়ে তোলেন। বিদ্রোহ ঘটে। ফারাও আমেনথম সিংহাসন হারান। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সিংহাসনে বসেন ও নতুন রাজবংশের শাসন শুরু করেন।

আমেনথমের আমলে সাম্রাজ্যের নানা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও স্বাধীন হয়ে যায়। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন সব স্বাধীন হয়। সাম্রাজ্য ছোট হয়ে পড়ে। মিশরও তুর্বল হয়ে পড়ে।

আমেনথমের মৃত্যুর ষাট বছর পরে মিশর সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস। হিটেটাইটদের সাথে তাঁর দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চলে। ষোল বছর যুদ্ধের পর তু'পক্ষ সন্ধি করে। ঠিক হল কেউ কাউকে আর আক্রমণ করবে না। এই সন্ধির পর মিশরের সাম্রাজ্য প্রায় ছ'শ বছর টিকে ছিল। এর পর মিশর অধিকার করে আফ্রিকার নুবিয়া দেশ। মিশরের গৌরব অস্তমিত হয়।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে মিশরের শাসকরা বলত প্রদেশ। প্রদেশ শাসনের জন্য ফারাওর ছেলে বা নিকট কোন আত্মীয়কে পাঠান হত। তাঁরা প্রদেশে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সাথে মিশত না, নিজেদের উচ্চশ্রেণীর মনে করে আলাদা হয়ে বাস করত। প্রদেশগুলো হতে সমস্ত সম্পদ আহরণ করে মিশরে পাঠাত। সিনাই অঞ্চলের তামার খনি হতে তামা তুলে সমস্ত তামা মিশরে পাঠান হত। আফ্রিকায় মিশরের সৈন্যরা সোনার খনির সন্ধান পায়। তারা তাল তাল সোনা মিশরে নিয়ে আসে। শাসন ও শোষণের কাজে মিশর পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদীদের চাইতে কম ছিল না।

পুরোহিতদের ক্ষমতা : মিশরের পুরোহিতদের কথাও এর আগের এক অধ্যায়ে বলা হয়েছে। মিশরের অগুন্তি মন্দিরের অসংখ্য পুরোহিত ছিলেন। জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল। তাঁরা জনগণকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তাঁরা ঠাকুরদেবতার বিশেষ প্রিয় লোক। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হয়। তাঁদের পরামর্শ মত না চললে, তাঁদের শ্মরণাপন্ন না হলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া যাবে না।

পুরোহিতরা কেবল ধর্মকর্ম নিয়েই থাকতেন না। দেশ শাসনেও তাঁদের বড় অংশ ছিল। আঞ্চলিক শাসনক্ষমতা ছিল তাঁদের হাতে। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল ছিল। দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ তাঁরা পেতেন। থেবস শহরের একজন পুরোহিতের আশি হাজার কর্মচারী ছিল। গৃহপালিত পশু, অর্থাৎ গোরু ভেড়া ছিল চার লক্ষের ওপর। ফারাওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে একজন পুরোহিত সিংহাসন অধিকার করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কাহিনী একটু আগেই পড়েছ।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাচীন মিশরের সাধারণ মানুষদের জীবনযাপন প্রণালীর পরিচয় দাও।
(খ) প্রাচীন মিশরের ফারাও পুরোহিতদের কর্মপদ্ধতি আলোচনা কর।
(গ) প্রাচীন মিশরবাসীদের রাজরাজাদের কথা বর্ণনা কর।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) হিকসসরা মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয় কেন ?
(খ) তৃতীয় থুথমস ও হাতসেপুটের সম্বন্ধে কি জান ?
(গ) আমেনথমের আমলে সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল ?
(ঘ) মিশরের পুরোহিতরা মানুষকে কি বোঝাত ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(১) **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) মিশর হল — নদীর দান।
(খ) ফারাও শব্দের অর্থ যিনি — বাড়িতে বাস করেন।
(গ) থেবস নগরের বর্তমান নাম —।
(ঘ) মিশরে সূর্য দেবতার নাম ছিল – ।
(ঙ) মিশরে যেমন — পুরোহিত ছিলেন, তেমনি — মন্দিরও ছিল।

(২) **এক একটি বাক্যে পরিচয় দাও ঃ**

(ক) হিকসস, (খ) দ্বিতীয় রামেসিস, (গ) সিনাই, (ঘ) থেবস।

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) হিকসসদের বিরুদ্ধে কারা বিদ্রোহ করে ?
(খ) তৃতীয় থুথমসের স্ত্রীর নাম কি ছিল ?
(গ) আমেনথমের পর কে মিশরের সিংহাসনে বসেন ?
(ঘ) মিশরের লোক কোথা থেকে সোনা আনত ?
(ঙ) থেবস শহরের একজন ধনী পুরোহিতের কি কি ছিল ?

১ (গ) ইরানের কাহিনী

- ইরানের জাগরণ
- জরথুস্ত্র ঃ তাঁর ধর্মমত

ইরানের জাগরণ ঃ ইরান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ইরানের সাথে ভারতের পরিচয় বহু প্রাচীনকাল থেকে। ইরানের আগের নাম ছিল পারস্য। ইরানের প্রাচীন মানুষরা আর্যগোষ্ঠীর এক শাখার লোক ছিল। তাদের ভাষাও ছিল আর্যভাষা। ইরান কথাটিও এসেছে আর্য বা এরিয়ান কথা থেকে।

বহু শতাব্দী বসবাসের পর পারস্যের মানুষদের দুটি দল বা শাখা প্রবল হয়ে ওঠে। একটি হল মিডি। এরা থাকত উত্তর পারস্যে। অপর দল নিজেদের বলত পারসিক বা পারস্যের অধিবাসী। তারা থাকত দেশের দক্ষিণদিকে।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ পঞ্চাশ বছর আগে সমগ্র পারস্য অধিকার করেন সম্রাট সাইরাস। তিনি পারস্যে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমশই তাঁর সাম্রাজ্য শক্তিশালী হতে থাকে।

প্রথমে তিনি জয় করেন এশিয়া মাইনরের লিডিয়া দেশ। এখান থেকে তিনি অনেক ধনরত্ন পান। লিডিয়া জয় করে সাইরাস ব্যাবিলন অভিযান করেন। ব্যাবিলনের বাইরে এক যুদ্ধে সাইরাস জয়ী হন। ব্যাবিলনের লোক শহর ধ্বংসের আশঙ্কায় বিনা বাধায় সাইরাসকে ব্যাবিলন অধিকার করতে দেয়। সাইরাস ব্যাবিলন অধিকার করেছিলেন যীশুর জন্মের পাঁচশ আট-তিরিশ বছর আগে।

সাইরাস আরও বহু দেশ জয় করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য লিডিয়া হতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাইরাসের পরে সম্রাট হন তাঁর পুত্র কেমবিসেস। তিনি মিশর জয় করে পারস্য সাম্রাজ্য আরও বড় করেন। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন তাঁর এক মন্ত্রীর পুত্র দরায়ুস।

দরায়ুস পারস্য সাম্রাজ্য এত বড় করেছিলেন যে, এর আগে পৃথিবীতে আর কেউ এত বড় সাম্রাজ্য গড়তে পারেন নি। রাশিয়ার ভলগা নদী পর্যন্ত তাঁর অধিকারে ছিল ; ভারতের রাজপুতনার মরুভূমিও তাঁর সৈন্যরা জয়

করেছিল। দরায়ুস ইউরোপেও অভিযান পাঠিয়েছিলেন কিন্তু শকরা বাধা দেওয়ায় তা জয় করা সম্ভব হয় নি।

এশিয়া মাইনরে অনেক গ্রীক উপনিবেশ ছিল। এশিয়া মাইনর জয় করে দরায়ুস গ্রীক উপনিবেশও অধিকার করেন। পরে এখানে এক বিদ্রোহ হয় এবং তাতে সারডিস শহর ধ্বংস হয়। গ্রীসের এথেনসবাসীরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। দরায়ুস চাইলেন এথেনস জয় করে তাদের শাস্তি দিতে। এথেনস জয়ের জন্য তিনি এক বিরাট বাহিনী পাঠালেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভিযান ব্যর্থ হল। দ্বিতীয়বার তিনি আরও শক্তিশালী আর এক অভিযান পাঠান। পারস্যের সৈন্যরা এথেনসের কাছে মারাথন পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। গ্রীকরা অসীম সাহসের সঙ্গে পারস্য সৈন্যদের আক্রমণ করে পরাজিত করে। মারাথনের এই যুদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'মারাথনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে। এই যুদ্ধ হয় যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশ নব্বুই বছর আগে।


দরায়ুস

মারাথন যুদ্ধের কিছুকাল পরে দরায়ুস মারা যান।

নতুন সম্রাট হলেন দরায়ুসের পুত্র জারকসেজ। পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার সঙ্কল্প নিয়ে মারাথন যুদ্ধের দশ বছর পরে তিনি গ্রীস বিজয়ে বের হলেন। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীতে চৌষট্টিটি দেশের সৈন্য ছিল। ভারতের সৈন্যও এই দলে ছিল। ভারতের তৈরী যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। গ্রীসে যেতে হলে দারদানালিস প্রণালী পার হতে হত। জারকসেজের সসৈন্যে দারদানালিস পার হওয়া সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জারকসেজ ঐ প্রণালীর ওপর একটি সেতু তৈরি করতে আদেশ দিলেন। সেতু তৈরি করা হল কিন্তু জলের তোড়ে তা ভেসে গেল। সম্রাট জারকসেজ এতে সমুদ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন, সমুদ্রকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন, 'তিনশ বার বেত মেরে সমুদ্রকে শিক্ষা দাও'। সম্রাটের হুকুম অবিলম্বে পালিত হল। সমুদ্রের জলের ওপর তিনশ বার বেত মারা হল। সমুদ্র ভয় পেয়েছিল কিনা কেউ বলতে পারে নি। তবে নৌকোর সংগে নৌকো বেঁধে পরে সৈন্যরা প্রণালী পার হয়েছিল।

সম্রাট একটা উঁচু জায়গায় মারবেল পাথরের সিংহাসনে বসে তা পরিদর্শন করেছিলেন।

জারকসেজের সৈন্যরা থারমপলির পাহাড়ের পথে গ্রীসের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। এই সময় পথে ছ'শ জন স্পারটান সৈন্য একে একে প্রাণ দিয়ে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে। এর পরে আরটিমিসে এক নৌযুদ্ধ হয়। তাতেও গ্রীসের পরাজয় হয়। কিন্তু পরে সালামিসের নৌযুদ্ধে গ্রীকরা পারস্যকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। পরাজিত পারস্য সম্রাট দেশে ফিরতে বাধ্য হয়।

পারস্য সাম্রাজ্য এর পর আরও একশ বছর টিকে ছিল। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার তারপর পারস্য অধিকার করে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

জরথুস্ত্র ঃ তাঁর ধর্মমত ঃ ইরানবাসীদের ধর্মগুরুর নাম জরথুস্ত্র। তিনি ইরানে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি। অনেকের মতে তিনি গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

জরথুস্ত্রর আগে ইরানের মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। ভারতের আর্যরাও তাই করত। জরথুস্ত্রর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর ধর্মনীতি ও স্তবস্তোত্র একত্রিত করে 'জেন্দ আবেস্তা' নামে একখানা ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থ হতে জরথুস্ত্রর ধর্মবিশ্বাস ও উপদেশের কথা জানা যায়।

জরথুস্ত্র বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীতে সৎ ও অসৎ এই দুই শক্তির মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব চলছে। সৎ শক্তির দেবতা হলেন অহুর মাজদা। তিনি আলো, সত্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল মঙ্গলের অধিকারী দেবতা। আর অসৎ শক্তির দেবতা হলেন আহরিমান। তিনি হলেন পৃথিবীর যাবতীয় অমঙ্গল—যেমন অন্ধকার, কপটতা, অন্যায় প্রভৃতি দুষ্ট শক্তির দেবতা।

জরথুস্ত্র ইরানের লোকদের অহুর মাজদার উপাসনা প্রবর্তন করেন।

ইরানবাসীদের কোন দেবতা ছিল না। তাদের পুরোহিত ছিল। মন্দিরের মাঝখানে বেদী তৈরি করে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের সামনে উপাসনা করা হত। ইরানীরা এই আগুনকে অতি পবিত্র মনে করত। তারা এই আগুন কখনও নিভতে দেয় নি। অনির্বাণ এই আগুন। পুরানো মন্দির হতে এই আগুন নিয়ে নতুন মন্দিরে নতুন করে জ্বালান হত। শত শত বছর ধরে ইরানীদের এই পবিত্র আগুন জ্বলে আসছে।

এখন ইরানে আর জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী নেই। আছে আমাদের ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বীদের আমরা বলি পারসী।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইরানের সম্রাটদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা যা জান লেখ।
(খ) জরথুস্ত্র কে ছিলেন? তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। **টীকা লেখ ঃ**

দরায়ুস, জারকসেজ, জরথুস্ত্র, মিডি, জেন্দা আবেস্তা, অহুর মাজদা, থারমপলীর যুদ্ধ, মারাথনের যুদ্ধ।

৩। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) দরায়ুসের পুত্রের নাম কি? তিনি কিরূপ সম্রাট ছিলেন?
(খ) থারমপলির যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান?
(গ) জরথুস্ত্রের ধর্মমতের সার কথাগুলি লেখ।

৪। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) ইরানের প্রাচীন মানুষরা — এক শাখার লোক ছিল।
(খ) ইরান কথাটি এসেছে — কথা থেকে।
(গ) — পারস্যে প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।
(ঘ) সাইরাসের পর সম্রাট হল তাঁর পুত্র —।
(ঙ) ইরানবাসীদের ধর্মগুরুর নাম —।

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) বিভক্ত পারস্যকে কোন সম্রাট এক সাম্রাজ্যের মধ্যে আনেন?
(খ) কেম্বিসেসের পর কে পারস্য সম্রাট হন?
(গ) দরায়ুসের সাম্রাজ্যের সীমানা বল।
(ঘ) মারাথনের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?
(ঙ) থারমপলির যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয় এবং কারা জয়ী হয়?

১ (ঘ) ইহুদিদের কথা

- মিশরে হিবরুগণ
- মোজেজ ঃ দাসত্ব হতে ইহুদিদের মুক্তি

মিশরে হিবরুগণ ঃ জু'দের ভাল নাম হল হিবরু। তাদের আর একটা নাম ইহুদি। সারা পৃথিবীতে তারা এখন 'জু' নামেই বেশি পরিচিত। ইহুদিদের গল্প বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেনটে আছে।

ইহুদিদের আদি পুরুষের নাম আবরাহাম। মেসোপটেমিয়ায় উর শহরের বাইরে তিনি তাঁর ভেড়াছাগলের পাল নিয়ে বাস করতেন। একদিন তিনি দৈববাণী শোনেন। দৈববাণীতে এই দেশ ছেড়ে তাঁকে এক নতুন দেশে যেতে বলা হয়। আরও বলা হয় আবরাহাম একটা জাতির বহু মানুষের জনক হবেন। ইহুদি ভাষায় আবরাহাম কথার অর্থও বহুজনের জনক।

দৈববাণী শুনে আবরাহাম তাঁর দলের লোকজন আর পশুর পাল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। দৈববাণীতে যে দেশের কথা বলা হয়েছিল, ইহুদিরা তাকে বলে 'প্রতিশ্রুত দেশ'। অর্থাৎ ভগবান তাদের এই দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বহুদিন পশুর পাল আর লোকজন নিয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ভূমধ্য সাগরের ধারে ইউফ্রেতিস নদীর তীরে এসে আবরাহাম পৌছন। অনেক কষ্টে নদী পার হয়ে এলেন এক দেশে—বাইবেলে যার নাম 'কানান'। এখন এই দেশের নাম হয়েছে ইজরায়েল।

ইজরায়েলে এর আগেও লোক বাস করত। তারা এই নতুন লোকদের দেখে জানতে চাইল—তারা কোথা থেকে এসেছে। ইহুদিরা বলল—তারা নদীর ওপার থেকে এসেছে। শুনে লোকেরা বলে উঠল, 'হিবরু'। তাদের ভাষায় হিবরু হল, যারা নদীর ওপার থেকে আসে। সেই থেকে ইহুদিদের আর এক নাম হল হিবরু।

নতুন দেশে ইহুদিরা বেশ কিছুকাল ভালই ছিল। এখানে তাদের নিজেদের ও পোষা পশুর খাদ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে খাদ্যাভাব সুরু হল। তারা আবার এই দেশ ছেড়ে পথে বেরুল। এবার নেতা ছিল আবরাহামের পৌত্র জেকব। তারা এল মিশরে। মিশরেও কোন খাদ্যের অভাব ছিল না। ইহুদিরা মিশরে বেশ ভালভাবে বাস করতে লাগল। তাদের অবস্থা ভাল হল। অনেকের সম্পত্তিও হল। আবরাহামের বংশের একজন মিশরের রাজ্যপাল পর্যন্ত হয়েছিল। মিশরে ইহুদিদের কোন অসুবিধা ছিল না। ইতিমধ্যে হিকসসরা এসে মিশর

অধিকার করে। হিকসসরাও ইহুদিদের মত পশু পালন করত। তাই তাদের সঙ্গে ইহুদিদের ভাল মিল হল। কিন্তু হিকসসদের তাড়িয়ে দিয়ে মিশর যখন স্বাধীন হল, তখন এল ইহুদিদের দুর্দিন। হিকসসদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য মিশরের নতুন সরকার দেশের সমস্ত ইহুদিদের আটক করল এবং তাদের ক্রীতদাস করে রাখল। মিশর রাজ্যের যত সব পরিশ্রমের কাজ—পিরামিড তৈরি, রাস্তা তৈরি প্রভৃতি সব করাতে লাগল তাদের দিয়ে। তারা যাতে পালিয়ে না যায়, তার জন্য চারদিকে পাহারা বসান হল। দুঃখ কষ্ট অপমানের জীবন তাদের বহুদিন ভোগ করতে হয়। অবশেষে তাদের উদ্ধার করেন মোজেজ।

মোজেজ ঃ দাসত্ব হতে ইহুদিদের মুক্তি ঃ মোজেজের আর এক নাম মুসা। তিনিও ছিলেন ইহুদি সন্তান। তা তিনি প্রথম জানতেন না। তিনি মানুষ হয়েছিলেন ফারাওর ঘরে। জন্মের পর মুসার মা ঝুড়িতে করে তাঁকে নীল নদের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এক ফারাওর মেয়ে তুলে এনে তাঁকে মানুষ করে। মেয়েটির নিজের কোন সন্তান ছিল না। মিশরীয়দের সঙ্গে মিশে মোজেজও এক সময় ইহুদিদের ওপর কম অত্যাচার করেন নি। কিন্তু শেষে তিনি নিজের জন্মকথা জানতে পারলেন। মোজেজ নাকি স্বপ্নে তাঁর নিজের পরিচয় জানতে পারেন। তাঁকে স্বপ্নাদেশে বলা হয়—দাস ইহুদিদের মুক্ত করতে।

দাস ইহুদিদের মুক্তি দিতে মোজেজ ফারাওকে অনুরোধ করলেন। তখন ফারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস। প্রথমে তিনি তা মেনে নেন নি। কিন্তু পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটল ফারাওর সংসারে। ভয় পেয়ে তিনি ইহুদিদের মুক্তি দিতে রাজি হলেন।

কাহিনীতে বলা হয়েছে, মোজেজ মিশরের সমস্ত ইহুদিদের নিয়ে 'প্রতিশ্রুত দেশের' উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর আরবের মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে অবশেষে মোজেজ ও তাঁর দলের লোকেরা লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছন। সাগর পার হবার জন্য মোজেজ তাঁর হাতের দণ্ড জলে ছোঁয়াতে সাগরের জল দু দিকে সরে যায়। মাঝখান দিয়ে এক পথ বেরোয়। লোকজন নিয়ে মোজেজ এই পথে সাগর পার হতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মিশরের নতুন ফারাও সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি ইহুদিদের মুক্তি দিতে চান নি। তাই ইহুদিদের ধরে আনার জন্য তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন। মোজেজ যখন সাগর পার হচ্ছিলেন ফারাওর সৈন্যরাও তখন সাগরের

তীরে এসে পৌঁছয়। ইহুদিদের ধরবার জন্য সাগরের পথে তারাও নেমে পড়ে। কিন্তু ইহুদিরা অপর তীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাগরের জল আবার জোড়া লেগে গেল। ফারাওর সৈন্যসামন্ত সাগরের জলে ডুবে প্রাণ হারাল।

এই কাহিনী কতটা সত্য তা কেউ বলতে পারে নি। তবে মোজেজ যে মিশরের দাসত্ব হতে ইহুদিদের মুক্ত করেছিলেন তা সত্য ঘটনা।

মোজেজ ইহুদিদের প্রতিশ্রুত দেশ প্যালেসটাইনে নিয়ে আসেন এবং তাদের একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা দেন। এ ঘটনা হল যীশুখ্রীষ্টের জন্মের (আনুমানিক ১২২৫ খ্রীঃ পূঃ—১২২০ খ্রীঃ পূঃ) আগের ঘটনা। মোজেজ তাদের জীবনের পথনির্দেশ করে দশটি উপদেশ দেন। ইংরেজিতে একে বলে 'টেন কম্যানডমেনটস'। ইহুদিদের ইতিহাসে আরও অনেক ঘটনা ঘটে। বড় হয়ে তোমরা সে সব কাহিনী পড়তে পারবে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইহুদিরা কোথাকার লোক ? তাদের কথা যা জান বল।

(খ) মোজেজ কে ছিলেন ? কিভাবে তিনি ইহুদিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন ? কেন তাঁকে মুক্তি দাতা বলা হয় ?

২। **টীকা লেখ ঃ** (ক) হিবরু, (খ) আবরাহাম, (গ) প্রতিশ্রুত দেশ।

৩। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইহুদিরা কাদের কাছে কেন হিবরু নামে আখ্যাত হয় ?

(খ) মিশরে ইহুদিরা কেমন অবস্থায় ছিল ?

(গ) কে মিশরের দাস থেকে ইহুদিদের কেমন ভাবে মুক্ত করেন ?

(ঘ) ইহুদিদের 'প্রতিশ্রুত দেশ' কোনটি ? মোজেসের 'টেন কম্যানডমেণ্টস্'-এর বিষয় কি জান ?

৪। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

সঠিক কথাটির তলায় দাগ দাও ঃ

(ক) ইহুদিদের আদিপুরুষের নাম (মোজেজ/আবরাহাম)

(খ) আবরাহাম ছিলেন (সম্রাট/মেষপালক)

(গ) ইজরায়েলকে আগে বলা হত (মিশর/কানান)

(ঘ) মিশর থেকে দাস ইহুদিদের মুক্ত করেন (মোজেজ/আবরাহাম)

(ঙ) মিশরের ফারাও (দ্বিতীয় রামেসিস/তৃতীয় থুথমসের) আমলে মোজেজ দাস ইহুদিদের মুক্ত করেন।

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইহুদিদের অপর নাম কি ?

(খ) তাদের কথা কোন বইয়ে আছে ?

(গ) আবরাহাম কথার অর্থ কি ?

(ঘ) আবরাহামের পৌত্রের নাম কি ছিল ?

(ঙ) কে ইহুদিদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন ?

২। গ্রীসের ইতিহাস

- গ্রীক সভ্যতায় ক্রীটের অবদান
- হোমারের আমলের গ্রীস
- নগর-রাষ্ট্র ঃ সাংস্কৃতিক একতা ঃ উপনিবেশ
- এথেনস-স্পারটার জীবনধারা
- এথেনস-স্পারটার প্রতিযোগিতা
- এথেনসের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
- ম্যাসিডন ঃ আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান
- সাম্রাজ্যের পতন
- রোমান বিজয়

গ্রীক সভ্যতায় ক্রীটের অবদান ঃ আগে ধারণা ছিল গ্রীস সর্বপ্রথম ইউরোপে সভ্যতা বিস্তার করে। এখন আবিষ্কার করা হয়েছে, গ্রীসের আগে ভূমধ্য সাগরের ক্রীট দ্বীপে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গ্রীস তার উচ্চ সভ্যতার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীদের কাছ থেকে।



গ্রীসের দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের মাঝে ক্রীট দ্বীপ। আদি কাল থেকেই এখানে মানুষ বাস করে আসছিল। বাইরে থেকে কোন আক্রমণের ভয়

না থাকায় দ্বীপের মানুষরা ধীরে ধীরে নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলে। ক্রীটের সভ্যতার সব কথা এখনও জানা যায় নি। তখনকার দিনের তাদের লেখা কেউ পড়তে পারে নি। এখানে মাটির নিচে খুব বড় ও সুন্দর একটি প্রাসাদ আবিষ্কার হয়েছে। প্রাসাদটি ছিল দ্বীপের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটির নাম নসাস। অতি মনোরম দেয়াল চিত্র, সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নানা কারুকার্যে প্রাসাদটি সাজানো ছিল। এই দ্বীপের লোকদের বিরাট নৌবহর ছিল এবং তারা ব্যবসাবাণিজ্য করত। এজিয়ান উপসাগরের অনেক দ্বীপের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। ব্যবসা উপলক্ষেই ক্রীটের লোকেরা গ্রীসে আসত এবং গ্রীকরা তাদের কাছ থেকে উন্নত জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা পায়। ক্রীট দ্বীপের সভ্যতার নাম 'মিনোয়ান' সভ্যতা। ক্রীটের রাজাকে বলা হত মিনো।


গ্রীসের পাত্র

গ্রীকরা এই দ্বীপের সভ্যতার কথা জানত। দ্বীপের রাজা মিনোকে গ্রীকরা ভয় করত। ক্রীটের রাজার আদেশে প্রতি বছর গ্রীস থেকে দশজন যুবক-যুবতীকে সেখানে পাঠাতে হত। তারা ক্রীটের একচক্ষু দৈত্যের হাতে প্রাণ হারাত। এই গল্প গ্রীসের মানুষরাই গ্রীক পুরাণে লিখেছে। গ্রীকদের অনেক দেবদেবীর আবাসস্থলও ছিল এই দ্বীপটি। আইকেরাস ও তার বাবা ডিডেলাস তুলো আর পালক দিয়ে ডানা বানিয়ে নিজেদের দেহের সঙ্গে জুড়ে কিভাবে ক্রীট হতে উড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল সে গল্পও তোমরা হয়ত পড়েছ।

গ্রীকরা এই দ্বীপের সভ্যতা হতে অনুপ্রেরণা পেয়ে নিজেদের উচ্চ সভ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। পণ্ডিতরা মনে করেন, গ্রীস বড় হয়ে পরে ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা ধ্বংস করেছিল।

হোমারের আমলের গ্রীস ঃ গ্রীকরা গ্রীসের আদি বাসিন্দা নয়। গ্রীকরা আর্যগোষ্ঠীর এক শাখার মানুষ। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন

হাজার বছর আগে পূর্ব ইউরোপ থেকে তারা গ্রীসে আসে। ভারতের আর্যদের মতই তারাও এক একজন দলপতির অধীনে ছোট ছোট দলে গ্রীসে প্রবেশ করে ও বসবাস করতে থাকে। এই বসতিগুলিই পরে রাজ্য হয়ে ওঠে। আমরা গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের কথা পরে আলোচনা করব।



অন্ধ-কবি হোমার

গ্রীসের আর্যরাও অপর আর্যদের মত গান, কবিতা রচনা করতে ভালবাসত। গ্রীসে প্রাচীনকালেই রচিত হয়েছিল দুটি মহাকাব্য। এর একটির নাম ইলিয়ড, অপরটি ওডিসি। মহাকাব্য দুখানি রচনা করেছিলেন অন্ধ-কবি হোমার।

হোমার ইলিয়ড রচনা করেন ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে। আর ওডিসি লেখেন ট্রয় যুদ্ধের এক বীর ইউলিসিসের সমুদ্রপথে দেশে ফেরার অভিজ্ঞতার ঘটনা নিয়ে। বড় হয়ে তোমরা বই দুখানা পড়লে আনন্দ পাবে।

হোমারের মহাকাব্য দুখানি পড়ে সে যুগের গ্রীসের কথা জানা যায়। তখন গ্রীসের মানুষ গ্রামে বাস করত। তাদের ঘরবাড়ি মজবুত ছিল না। কুটিরের মত ছিল তাদের ঘর। ক্রমে তারা শহর বানায় এবং উন্নত জীবন যাপন করতে শেখে। তাদের গড়া শহরগুলি ছিল এথেনস, কোরিনথ, থিবস, স্পারটা প্রভৃতি। হোমারের যুগে, অর্থাৎ যে সময়ের কথা তিনি লিখেছেন তখন গ্রীসে লোহার ব্যবহার ছিল না।

গ্রীসে বহু রাজ্য ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের রাজা ছিলেন। রাজাদের ক্ষমতা ছিল খুব বেশি। রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত। দেশের আইন তৈরি হত জনসাধারণের মত নিয়ে। এর জন্য ছিল দুটি করে পরিষদ। একটি জনসাধারণের, অপরটি বয়োবৃদ্ধদের। পরিষদ দুটির মতামত নিয়ে দেশের শাসন চলত। পরে গ্রীসের অনেক দেশে রাজপদ লোপ পায় এবং অভিজাতরা ক্ষমতায় আসে।

হোমারের সময় গ্রীসের সমাজে চার শ্রেণীর মানুষ ছিল। এরা হল—অভিজাত, সাধারণ নাগরিক, স্বাধীন শ্রমিক আর ক্রীতদাস।

এরা সহজ সরল জীবন যাপন করত। নিজের কাজ নিজের হাতে করত। রাজবাড়ির লোকেরাও নিজের কাজ নিজেরা করে নিতে লজ্জা করত না।

কৃষিকাজ আর পশুপালন ছিল প্রাচীন গ্রীসের মানুষদের প্রধান উপজীবিকা। তারা প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য করত না। এটা তারা পরে শিখে নেয়।



গ্রীক দেবতা জিউস

গ্রীসের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত তারা সকলেই হেলেন-এর সন্তান। হেলেন ছিলেন গ্রীসের অধিবাসীদের আদি জননী। নিজেদের তারা গ্রীক বলত না—বলত হেলেনিজ—অর্থাৎ হেলেনের সন্তান।

প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার রীতি ছিল। দেবতার সামনে তারা পশুবলিও দিত। গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে তাদের দেবতারা অলিমপাস পাহাড়ে বাস করত। তাদের সর্বপ্রধান দেবতার নাম জিউস। জিউস ছাড়া তাদের আরও অনেক দেবদেবী ছিল। তবে তারা সকলেই ছিল জিউসের সন্তান।

নগর-রাষ্ট্র ঃ সাংস্কৃতিক একতা ঃ গ্রীস দেশ পাহাড়পর্বতে ভরা। তাই দেশটা নানা ভাগে বিভক্ত। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সমতল অংশে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বাস করত। পাহাড়পর্বত পার হয়ে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যাওয়া কষ্টকর ছিল। গ্রীস তাই এক রাজার অধীনে ছিল না। ছোট ছোট সমতল জায়গায় যেখানে মানুষ থাকত কালক্রমে সেখানে গড়ে ওঠে এক একটি নগর। নগরগুলি হয় রাষ্ট্র। গ্রীসে বহু নগর-রাষ্ট্র ছিল।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের আলাদা রাজা বা শাসন-পরিষদ ছিল। সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী ছিল। তাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি এক জাতি এক প্রাণ হয়ে বাস করতে জানত না। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

মূলত সকল রাজ্যের মানুষই ছিল একই গ্রীক জাতির। তাদের ভাষা ছিল এক গ্রীক ভাষা। প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রের মানুষই মনে করত হোমারের মহাকাব্যে কেবল তাদের পূর্বপুরুষের বীরত্বের কথা বলা হয়েছে। গ্রীসের সকলেই দেবতা জিউসকে প্রধান দেবতা বলে মানত। ধর্মকর্মের ব্যাপারে

সকল রাষ্ট্র একই প্রকার নিয়মরীতি মেনে চলত। সমস্ত গ্রীস দেশের মধ্যে একতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য পরে ওলিমপিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হয়। প্রথম কেবলমাত্র গ্রীসের লোকই এই খেলায় যোগ দিতে পারত। গ্রীসে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভেদও ছিল আবার মিলনও ছিল প্রচুর। যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা মিলেমিশে থাকতে পারে নি। শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারে নি। নিজেরা মারামারি করে নিজেদের ধ্বংস করেছে। এথেনস আর স্পারটার ইতিহাসে আমরা তা দেখতে পাব।

উপনিবেশ ঃ গ্রীস ছোট দেশ। দেশে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, থাকার জায়গার অভাব হল। সকলের স্থান দেশে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাই তারা অন্য উপায়ে বাসস্থানের সমস্যা মেটাতে চাইল। ভূমধ্য সাগরের তীরের অন্যান্য জায়গায় গিয়ে তারা বসবাস শুরু করল। ব্যবসা-বাণিজ্যকে উপলক্ষ করে গ্রীসের কিছু মানুষ প্রথম বিদেশে যেতে আরম্ভ করে। যেখানে তারা যেত সেখানে নিজেদের মত ঘরবাড়ি করে পাকাপাকি বসবাসের বন্দোবস্ত করত। এইভাবে সাইপ্রাসে, ইতালিতে, সিসিলিতে, স্পেনে, রোন নদীর উপত্যকায় গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। গ্রীকরা এশিয়া মাইনরের দেশেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গ্রীকদের তৈরী এশিয়া মাইনরের বাইজানটাইন উপনিবেশ বড় হয়ে পরে রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের রাজধানী হয়। এই শহরের এখনকার নাম ইসতামবুল।

গ্রীস থেকে দলে দলে কৃষক-মজুররাও গিয়ে উপনিবেশসমূহে বাস করতে থাকে। নিজেদের দেশে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। উপনিবেশে গিয়ে তারা সচ্ছলভাবে থাকতে পারত। গ্রীস ছেড়ে চাষীর দল তাই উপনিবেশে চলে যেত। তাদের আসার ফলে উপনিবেশগুলি বড় হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে এইসব উপনিবেশগুলি প্রচুর সাহায্য করে।

এথেনস-স্পারটার জীবনধারা ঃ এথেনস আর স্পারটা গ্রীসের দুটি প্রধান রাষ্ট্র। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। স্পারটার লোকেরা সব সময়ই যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকত। তাই তাদের জীবনযাপন প্রণালীও ছিল সৈনিকদের মত।

স্পারটায় দু'জন করে রাজা রাজত্ব করতেন। একজন যখন যেতেন যুদ্ধ করতে, অপরজন তখন করতেন দেশ শাসন। শাসন কাজে রাজাকে পরামর্শ

দিত দুটি পরিষদ। একটি পরিষদ বৃদ্ধদের। ষাট বছরের উপরের বৃদ্ধরাই এই পরিষদের সদস্য হতে পারতেন। অপর পরিষদ ছিল জনসাধারণের।

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা এবং বীরের মত লড়াই করাই ছিল স্পারটার লোকদের জীবনের একমাত্র উচ্চ আদর্শ। ছেলেবেলা থেকেই তাদের যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হত। সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরই তাকে একদল অভিজ্ঞ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরীক্ষা করত। তারা দেখত শিশুটির দেহে কোন খুঁত আছে কিনা। সে দুর্বল বিকলাঙ্গ হবে কিনা। দুর্বল বিকলাঙ্গ সন্তান হলে তাকে তৎক্ষণাৎ টায়াজিটাস পাহাড়ের চূড়া হতে নিচের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হত। জন্তু-জানোয়াররা হতভাগ্য শিশুটিকে খেয়ে ফেলত। কিন্তু এর জন্য স্পারটার মায়েদের চোখ দিয়ে একবিন্দু জল পড়ত না। স্পারটার বাবা-মা সকলেরই একমাত্র কামনা ছিল জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করা। কাজেকাজেই দুর্বল বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য কোন মায়া তাদের হত না। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশু বাবা-মার কাছে থাকত। এই সময় তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা হত। সাত বছরের হলে তাকে পাঠান হত সরকারী সেনানিবাসে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য। এখানে তার দিন কাটত কুচকাওয়াজ আর দৌড়ঝাঁপ লাফালাফি নানা শারীরিক শ্রমের খেলাধুলো করে। ক্রমে তাকে শেখানো হত ডিসকাস ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া এবং নানা অস্ত্রের ব্যবহার। জামাকাপড় দেওয়া হত খুব কম। একই কাপড় পরে সে শীত-গ্রীষ্ম কাটাত। তাকে সব সময় স্নানও করতে দেওয়া হত না। বিশেষ উৎসবের দিনেই কেবল সে স্নান করার অনুমতি পেত। পেট ভরে তাদের খাবার দেওয়া হত না। আর যতটুকু দরকার—বলা হত চুরি করে খেতে। চুরি করা অন্যায় বা অপরাধ, একথা তারা ভাবত না। কেননা চুরি করতে বুদ্ধি লাগে, সাহস দরকার হয়। বুদ্ধি আর সাহস বাড়াবার জন্য তাদের চুরি করতে বলা হত। কিন্তু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে আর রক্ষা ছিল না। ধরা পড়লে প্রমাণ হত, তার বুদ্ধি ও সাহস কম। এইজন্য তাকে সাজা দেওয়া হত।

সাত বছর থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সেনানিবাসে থাকতে হত। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে হত। মেয়েদেরও কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানা প্রকার ব্যায়াম করতে হত। স্থলযুদ্ধে সারা গ্রীসে স্পারটানদের মত পারদর্শী আর কোন দেশের মানুষ ছিল না। একসময় তারা দক্ষিণ গ্রীসের প্রায় সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে নেয়। খুব সহজ সরল ভাবে তারা থাকত। কোন বিলাসিতা তাদের ছিল না। যুদ্ধ করা ছাড়া তারা আর কোন কাজ

করত না। বাদবাকি কাজকর্মের জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে দাসদের ওপর নির্ভর করত।

এথেনসের অবস্থা ছিল কিন্তু অন্যরকম। প্রথম থেকেই এথেনসের মানুষ ছিল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের কোন রাজা ছিল না। দেশ শাসন করত কয়েকজন ব্যক্তি। তাদের বলা হত আরকন। আরকনদের আমলে এথেনসের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বেশির ভাগ মানুষই ছিল গরীব। বাঁচার জন্য ধনীদের কাছ থেকে তাদের টাকাপয়সা ধার করতে হত। ঠিক সময়ে টাকা শোধ দিতে না পারলে মহাজন তাকে দাস করে রাখত। আইনকানুনও ছিল কঠোর। সামান্য চুরির অপরাধেও মানুষের ফাঁসী হত। বহুদিন ধরে এথেনসের সাধারণ মানুষ এমন অসহনীয় অবস্থায় বাস করে এসেছে। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহ দমন করে এথেনসে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন সোলন। সোলনের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে তাঁকে এথেনসের প্রধান করা হয়।

সোলন ছিলেন খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ভেবে দেখলেন, আগেকার শাসনব্যবস্থা সব একসঙ্গে পালটে দিলে অনেকে অসন্তুষ্ট হতে পারে। তিনি একটা মাঝারি পথ বের করলেন। তিনি পুরানো দিনের আরকনদের পদ রাখলেন কিন্তু তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলেন। দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা দিলেন সেনেট বা বয়োবৃদ্ধদের সভা এবং ইক্‌লেসিয়া বা জনসাধারণের সভার হাতে। সেনেটের ছিল পাঁচশ জন সদস্য। আর এথেনসের নাগরিকমাত্রই ছিল জনসাধারণের সভা বা ইক্‌লেসিয়ার সদস্য। ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচন করা হত না।

এথেনসের বাইরে খোলা মাঠে সপ্তাহে একদিন করে জনসাধারণের সভার অধিবেশন বসত। সকল নাগরিকই সভায় যোগ দিতে পারত। সভার প্রথমে হত প্রার্থনা। পরে শুরু হত আলোচনা। রাজ্যের ভালমন্দ সব বিষয়ই এখানে আলোচনা হত। যার খুশি সে অংশ নিত। সকলেরই বাক্‌স্বাধীনতা ছিল। নির্ভয়ে সকলেই নিজ নিজ বক্তব্য সভায় রাখত। কেবল দাসরা এই সভায় যোগ দিতে পারত না, কেননা তারা নাগরিক ছিল না।

রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করত সেনেট। সোলন শাসন ব্যাপারে জনগণের অধিকার স্বীকার করে এথেনসের গণতন্ত্র মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য সোলন সকলের ঋণ বাতিল করে দেন। টাকা না দিলে মানুষকে দাস করে রাখার যে প্রথা ছিল, তা রহিত করেন। ধারের টাকা শোধ দিতে হবে না জেনে গরীবরা খুশি হল। আগে সাধারণ মানুষের জমির ওপর কোন অধিকার ছিল না। জমি ছিল বড়-লোকদের। সোলন সাধারণ মানুষকে জমির মালিক হতে অনুমতি দেন। তিনি সকলকে লেখাপড়া স্বাস্থ্যচর্চা ব্যবসাবাণিজ্য করতে উৎসাহ দিতেন। যাতে তাদের নাগরিক চেতনা ও কর্তব্য জ্ঞান বাড়ে তার উপায় উদ্ভাবন করেন। ব্যবসাবাণিজ্যে মূলধনের দরকার। সেই মূলধন সোলন যোগাড় করলেন এথেনসের কাছের লাইরিয়াম পাহাড়ের খনি থেকে রুপো এনে। তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দেশে নানা ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে উঠল। এর ভেতর ছিল মাটির পাত্র তৈরির কারখানা, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা। সোলন বিদেশীদের এথেনসের নাগরিক অধিকার দিতেন মাত্র একটি শর্তে। তা হল এথেনসে তাদের কোন-না-কোন শিল্পকারখানা খুলতে হবে। এথেনস অনেক বাণিজ্যতরীও তৈরি করল।

সোলনের ব্যবস্থার ফলে এথেনস অচিরেই গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হল। এথেনসের গণতন্ত্র প্রায় দু'শ বছর টিকেছিল। এথেনসের মর্যাদা ও গৌরব আরও বাড়ে পেরিক্লিসের শাসনকালে। পেরিক্লিসের কথা পরে বলা হবে।

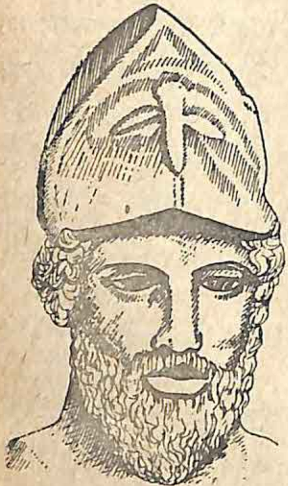
এথেনস-স্পারটার প্রতিযোগিতা: এথেনসের উন্নতিতে স্পারটার হিংসা হয়। স্পারটার সামরিক জীবনধারা ছিল এথেনসের গণতন্ত্রী আদর্শের বিপরীত। লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষা স্পারটা পছন্দ করত না। এথেনস গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হবে—স্পারটা তা কোন মতেই মানতে রাজি নয়। স্পারটা সুযোগ খুঁজছিল এথেনসকে জব্দ করার।

সে সুযোগ স্পারটা শীঘ্রই পেল। দক্ষিণ গ্রীসের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এথেনসের সাথে স্পারটার যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধ বাধার কারণ ছিল সামান্যই। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল গ্রীসে কে আধিপত্য করবে—স্পারটা না এথেনস।

স্পারটা-এথেনসের এই যুদ্ধকে ইতিহাসে বলে পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধ। দক্ষিণ গ্রীসের পেলোপোনেসিয়ায় যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল বলে এই নাম। তিনবার দু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্র দু পক্ষের কোন-না-

কোন পক্ষে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে এথেনস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। স্পারটা এথেনস নগরের চারদিকের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলল। নিজের মনের মত শাসন এথেনসে প্রচলন করল। এই ঘটনা ঘটে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশ চার বছর আগে।

এথেনসের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ এথেনসের তথা গ্রীসের সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে পেরিক্লিসের আমলে। এথেনসের গণতন্ত্রের প্রধান ছিলেন পেরিক্লিস।


পেরিক্লিস

পেরিক্লিসের জন্ম অভিজাত পরিবারে। তিনি সুশিক্ষা পান। পেশায় তিনি ছিলেন সেনানায়ক। তিনি ভাল বক্তৃতা দিতেন। রাজনীতিতে তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি সে যুগে আর কেউ ছিল না। এথেনসের মানুষ তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। তারা তাঁকে বার বার সমর পরিষদের প্রধান নির্বাচিত করে। এই পদে তিনি একতিরিশ বছর ছিলেন।

পেরিক্লিস ছিলেন উচ্চ আদর্শের মানুষ। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব দিতে—এমন কি নিজের প্রাণ দিতেও সদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর একতিরিশ বছরের শাসনকালে এথেনস সকল দিক দিয়ে উন্নতি করে। গ্রীসের অনেক রাজ্য পেরিক্লিসের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করে। তাঁর আমলে এথেনস সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তার লাভ করে। এথেনসের বিরাট নৌবাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এথেনস জলযুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এথেনসের বাণিজ্যবহরও তাঁর তৈরি। বড় বড় প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করে পেরিক্লিস এথেনসকে মনোরম করে গড়ে তোলেন। তিনি শিল্পী ও ভাস্করদের উৎসাহ দিতেন। এথেনসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার অপরূপ মূর্তিটি তাঁর আমলের তৈরি। একটি মন্দিরও তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মন্দিরটির নাম ছিল পারথেনন। তাঁর আমলে এথেনসে অনেক চিন্তাশীল দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাস্কর, নাট্যকার, সাহিত্যিক ছিলেন। গ্রীক সংস্কৃতিতে তাঁরা চিরস্থায়ী অবদান রেখে গেছেন।

দার্শনিকদের প্রধান ছিলেন সক্রেটিস। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কর্মকার। কম বয়সে সক্রেটিসও লোহার কাজ করতেন। এথেনসের সঙ্গে পারস্যের যখন যুদ্ধ হয়, তখন তিনি সাধারণ সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করেন। ফিরে এসে তিনি লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর কোন স্কুল ছিল না। কারো কাছ থেকে তিনি পয়সাও নিতেন না। নিজে ছিলেন দরিদ্র, তিনি ভাল জামাকাপড় পরতে পেতেন না। চেহারাও তাঁর সুশ্রী ছিল না। কিন্তু জ্ঞানে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

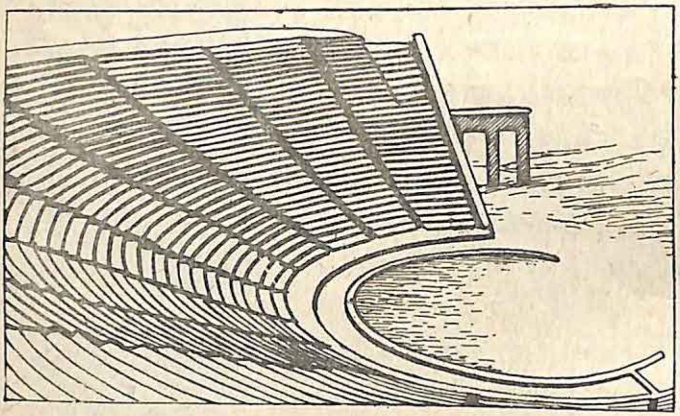


সক্রেটিস

সক্রেটিস রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে লোকের সঙ্গে কথা বলতেন, তাদের প্রশ্ন করতেন, আর উত্তর শুনে তাদের ভুল সংশোধন করতেন। তাঁর শিক্ষায় লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখল। সক্রেটিস বলতেন ঃ বিচারবিবেচনা না করে কোন কিছুই সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। যা সত্য তা সব সময়ই সত্য। সত্য মরে না। সক্রেটিসের নতুন চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে এথেনসের বহু যুবক তাঁর শিষ্য হন। এতে প্রশাসকরা হল ভীত। সক্রেটিসের শিক্ষা যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, এই অপবাদে বিচার হয়। বিচারে তাঁকে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করতে হয়। হেমলক বিষ খেয়ে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর। এই ঘটনা যীশুর জন্মের চারশ বছর আগের। সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য ছিলেন প্লেটো।

গ্রীক সাহিত্য বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্য এই যুগে খুব উন্নতি লাভ করে। নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আসকিলাস, সফোক্লিস এবং আরও অনেক নাট্যকার। এঁদের লেখা নাটক গ্রীসের লোক খুব ভালবাসত। আজও এঁদের নাটক পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদ করে অভিনীত হয়। সফোক্লিস একশ-র ওপর নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র সাতখানা নাটক

পরে পাওয়া যায়। আসকিলাস গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের জনক। তিনি মোট সত্তরখানা নাটক রচনা করেছিলেন। কার নাটক ভাল, এই নিয়ে এথেনসে একবার প্রতিযোগিতা হয়। দুজন নাট্যকারেরই নাটক অভিনয়



এমফিথিয়েটার

করা হল। দর্শকরা সফোক্লিসের নাটককে ভাল বললে। নাটক অভিনয়ের জন্য এথেনসে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ছিল। এর নাম এমফিথিয়েটার। এখানে হাজার হাজার দর্শকের বসবার জায়গা ছিল। নাটক সকলেই দেখতে পারত। এই মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ এখনও গ্রীসে দেখা যায়। প্রতি বছর ধর্ম উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এখানে তিনদিন অভিনয় হত। অভিনয়ের শেষে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে পুরস্কার দেওয়া হত।



হেরোডোটাস

ইতিহাস লেখাও এই যুগে আরম্ভ হয়। ইতিহাসের প্রথম বই লিখেছিলেন হেরোডোটাস। তিনি ইতিহাসের জনক। তাঁর আগে আর কেউ ইতিহাস লেখেন নি। এথেনস ও পারস্যের মধ্যে দীর্ঘকাল যে যুদ্ধ

হয় সেই ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর পরে আর একজন ঐতিহাসিকও ইতিহাস লিখেছিলেন। ইনি হলেন থুসিডাইডিস। পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের ইতিহাস তিনি লিখেছেন। কেবল নানা ঘটনার কথাই তিনি উল্লেখ করেন নি, ঘটনা কেন ঘটেছিল তার কারণও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর এই বইখানা এখনও বহু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়ে থাকে।

আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এথেনসে জন্মগ্রহণ করে গ্রীক সভ্যতা বিকাশে সহায়তা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী আরকিমিডিস, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রিটিস, নাট্যকার ইউরিপিডিস, বাগ্মী ডেমোস্থিনিস, সমরনায়ক এলকিথিডিয়াস প্রভৃতি।

এঁরা সকলেই গ্রীক সভ্যতার গৌরব।



থুসিডাইডিস

ম্যাসিডন ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ঃ এথেনস আর স্পারটা নিজেদের মধ্যে যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন উত্তর গ্রীসের পাহাড়ী রাজ্য ম্যাসিডন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন ফিলিপ। তিনি কয়েকটি গ্রীক রাজ্য অধিকার করে নিজের রাজ্য বাড়িয়ে তোলেন। সমস্ত গ্রীক রাজ্য সংঘবদ্ধ করে গ্রীসের চিরশত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে। একজন আততায়ী ফিলিপকে হত্যা করে।

ফিলিপের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনের রাজা হলেন তাঁর বিশ বছরের পুত্র আলেকজাণ্ডার। এই বয়সেই আলেকজাণ্ডার খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। ছোট বয়সে আলেকজাণ্ডার বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য এরিসটটলের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি হোমারের মহাকাব্য পড়ে উৎসাহিত হন এবং প্রাচীনকালের বীরদের মত একজন বীর হতে চান।

নতুন রাজার বয়স কম দেখে রাজ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। আলেকজাণ্ডার তাতে ভয় পেলেন না। তিনি দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে লাগলেন। বিদ্রোহীদের সবকিছু পুড়িয়ে

ছারখার করে দিলেন। থিবস নগর আলেকজাণ্ডার ধ্বংস করে ফেলেন। বিদ্রোহ দমন করে সমস্ত দেশ তিনি নিজের অধিকারে আনেন।

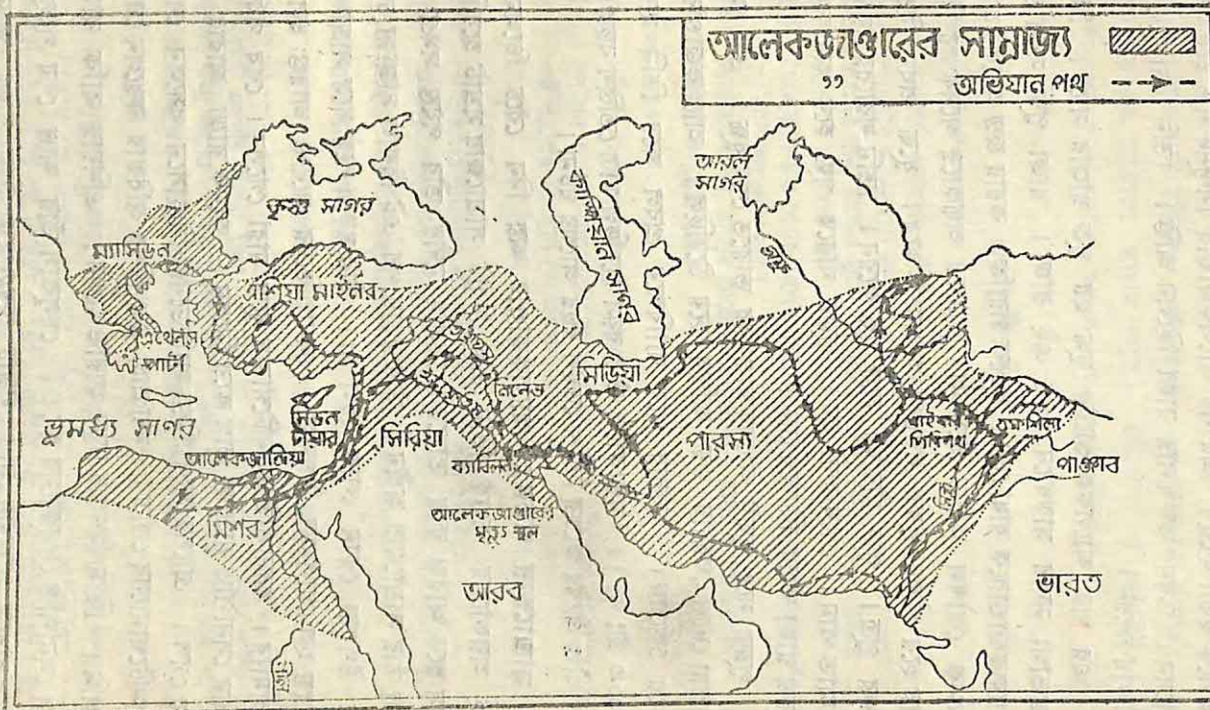
এরপর তিনি চাইলেন গ্রীসের চিরশত্রু পারস্য জয় করতে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিনশ চৌতিরিশ বছর আগে আলেকজাণ্ডার পারস্য জয়ের জন্য যাত্রা করেন। সঙ্গে নিলেন তিরিশ হাজার পদাতিক আর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। প্রথম এসে পৌছন এশিয়া মাইনরে। এখানে ছিল ট্রয় শহর। হোমার এই ট্রয়কে নিয়েই তাঁর ইলিয়ড মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ট্রয় শহরের মন্দিরে পূজা পাঠালেন। গ্রীক সৈন্যরা তাতে খুব খুশি হল। আলেকজাণ্ডার প্রায় দেড় বছর এশিয়া মাইনরে থেকে সিরিয়া, প্যালেসটাইন, মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করেন। এর পর তিনি পারস্যরাজ তৃতীয় দরায়ুসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাইগ্রিস নদীর তীরে দু পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দরায়ুস পালিয়ে যান। পরে তাঁরই একজন সেনাপতি তাঁকে হত্যা করে। এটা হল যীশুর জন্মের তিনশ একতিরিশ বছর আগের কথা।



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

এর পর আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযান করেন। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসেন (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ)। এখানে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। তাদের ভেতর কোন একতা ছিল না।

আলেকজাণ্ডার এদের আক্রমণ করলেন। আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার মতো শক্তি কোন রাজারই ছিল না। তবুও মাত্র তিন জন রাজা ছাড়া বিনা বাধায় কেউ গ্রীকদের অধীনতা মেনে নেন নি। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই রাজাদের কথা লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। পুষ্কলাবতীর রাজা তিরিশ দিন গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা যান। অশ্বকরাজও আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন। যুদ্ধে তিনি মারা গেলে তাঁর রানী যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দেশরক্ষার জন্য অনেক নারীও পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেন। গ্রীকরা অশ্বক রাজ্যের শিশু, বৃদ্ধ, নারী


আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
অভিযান পথ
কৃষ্ণ সাগর
আরল সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
ম্যাসিডন
এশিয়া মাইনর
এথেন্স
স্পার্টা
ভূমধ্য সাগর
সিডন
টায়ার
সিরিয়া
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
নিনেভ
মিডিয়া
ব্যাবিলন
পারস্য
আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু স্থল
আরব
খাইবার গিরিপথ
তক্ষশিলা
পাঞ্জাব
ভারত

সকলকে হত্যা করে। এর পর আলেকজাণ্ডার সিন্দুনদ পার হয়ে তক্ষশীলায় আসেন। তখন তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন।

এর পর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয় পুরু রাজার সাথে। ঝিলাম ও চন্দ্রভাগা নদীর মাঝখানে ছিল এই রাজ্য। রাজা পুরু সর্বশক্তি দিয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন। পুরুকে পরাজিত করার জন্য আলেকজাণ্ডারকে অনেক কৌশল করতে হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে অনেক দূর দিয়ে নদী পার হয়ে গ্রীকরা পুরুর সৈন্যদের আক্রমণ করে। যুদ্ধে প্রথম নিহত হন পুরুর পুত্র। পুরু বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি শরীরের নয় জায়গায় আঘাত পান। শেষে বন্দী হন। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

পুরুর সঙ্গে যুদ্ধই আলেকজাণ্ডারের ভারতে শেষ যুদ্ধ। এই সময় তাঁর সৈন্যরা দেশে ফেরবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে চললেন। ফেরার পথে ব্যাবিলনে প্রবল জ্বরে তিনি মারা যান (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর। এটা হল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিনশ তেইশ বছর আগের ঘটনা।

সাম্রাজ্যের পতন ঃ আলেকজাণ্ডার অল্প দিন বেঁচে ছিলেন কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন। গ্রীস হতে আরম্ভ করে ভারতের ঝিলাম নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্য চালাবার মত উপযুক্ত কোন লোক ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যব্যাপী আরম্ভ হল গোলমাল, বিশৃঙ্খলা। সেনাপতিদের মধ্যেও আরম্ভ হল ঝগড়া মারামারি। সেনাপতি এ্যানটিগোনাস যুদ্ধে মারা গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিন প্রধান সেনাপতি সাম্রাজ্য ভাগ করে নিলেন। অনেক রাজ্য আবার স্বাধীন হয়ে গেল। গ্রীসের অংশ নিয়ে ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসলেন সেনাপতি এ্যানটিগোনাসের পৌত্র। মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশর অধিকার করলেন সেনাপতি টলেমি। তিনি মিশরের নতুন ফারাও হলেন। এশিয়ার বাকি রাজ্যগুলি গেল সেনাপতি সেলুকাসের হাতে। সেলুকাস তাঁর অংশ শেষ পর্যন্ত পুরো বজায় রাখতে পারলেন না। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই কাহিনী আমরা পরে পড়ব।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের আর কোন চিহ্ন রইল না।

রোমান বিজয় ঃ ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইউরোপের ইতালিতে এক নতুন জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই জাতি হল রোমান জাতি। এরা ক্রমশ বড় হয়ে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইউরোপ ও আফরিকা এবং এশিয়া মাইনরের যে যে অঞ্চলে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ছিল রোম তা অধিকার করে নিল।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) হোমারের আমলের গ্রীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(খ) স্পারটার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(গ) গ্রীসের নানা রাষ্ট্রের নানা বিভেদের মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে একতা ছিল তা সংক্ষেপে বল।
(ঘ) আলেকজাণ্ডার কোন দেশের রাজা ছিলেন? তাঁর দিগ্বিজয় সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।
(ঙ) ভারতের কোন্ রাজার কাছে আলেকজাণ্ডার বাধা পেয়েছিলেন? এই যুদ্ধের ফলাফল বল।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) গ্রীকরা নিজেদের হেলেনিজ বলত কেন?
(খ) স্পারটা ও এথেনসের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাকে ইতিহাসে কি যুদ্ধ বলে? এই যুদ্ধের ইতিহাস কে লিখেছিলেন?
(গ) সোলন কে ছিলেন? তিনি এথেনসের গণতন্ত্রের জন্য কি করেছিলেন?
(ঘ) পেরিক্লিসের আমলকে গ্রীসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন?
(ঙ) আলেকজাণ্ডার কত বয়সে এবং কোথায় মারা যান?

৩। **টীকা লেখ ঃ** সক্রেটিস, হেরোডোটস, এথেনা, সফোক্লিস্।

৪। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ**

(ক) গ্রীসে প্রাচীনকালে রচিত হয়েছিল দুটি মহাকাব্য। এর একটির নাম —, অপরটি —। (খ) — দুজন করে রাজা রাজত্ব করতেন। (গ) স্পারটার বাবা-মা সকলেরই একমাত্র বাসনা ছিল — জাতিতে পরিণত করা। (ঘ) বুদ্ধি আর সাহস বাড়াবার জন্য তাদের — করতে বলা হত। (ঙ) স্পারটা-এথেনসের এই যুদ্ধকে ইতিহাসে বলে — যুদ্ধ। (চ) ইতিহাসের প্রথম বই লিখেছিলেন —।

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(১) 'মিনোয়ান' সভ্যতা কাকে বলে? (২) নসাস রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে কি জান? (৩) হোমার কে ছিলেন? তাঁর রচিত দু' খানি গ্রন্থের নাম লেখ। (৪) অলিম্পিকের সৃষ্টি হয় কিভাবে? (৫) স্পারটা ও এথেনসের মধ্যে কারা কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল? (৬) সক্রেটিস কে ছিলেন? তাঁর মৃত্যু হয় কিভাবে? (৭) আধুনিক নাটকের জন্মদাতা কে? (৮) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ হলে কে কোন অংশে সম্রাট হন?

৩। রোমের কাহিনী

- রোমের জাগরণ ● রোম-কারথেজ সংঘর্ষ
- রোমের সমাজ ঃ পেট্রীসিয়ান ও প্লেবিয়ান ঃ নাগরিক অধিকার
- দাসপ্রথা ঃ দাসীবিদ্রোহ
- জুলিয়াস সিজার ঃ গণতন্ত্রের অবসান
- সাম্রাজ্য ঃ সাম্রাজ্যের পতন
- খ্রীষ্টধর্মের প্রসার

রোমের জাগরণ ঃ এখন রোম ইতালি দেশের রাজধানী। এক সময় রোম নগরী ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাতশ তিপ্পান্ন বছর আগে রোমের প্রতিষ্ঠা হয়। টাইবার নদীর ধারে সাতটা টিলা পাহাড়ের ওপরে সাতখানা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে রোম।

রোমের উপকথায় রোম নগরীর আরম্ভের গল্প আছে। গল্পে বলা হয়েছে, রোমুলাস ও রেমাস ছিল যমজ ভাই। মাতামহের মৃত্যুর পর তাদের একজনের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু দূর সম্পর্কের এক মামা রাজা হওয়ার লোভে যমজ ভাইদের ঘোর জঙ্গলে ফেলে দেয়। ভেবেছিল বাঘ-ভালুকে তাদের মেরে ফেলবে। যমজ শিশুরা কিন্তু মরল না। এক নেকড়ে বাঘিনী নিজের বাচ্চাদের সাথে তাদেরও দুধ খাওয়াত। ভেড়া চরাতে গিয়ে একজন তাদের দেখতে পায় ও নিজের বাড়িতে এনে মানুষ করে। বড় হয়ে দুভাই রাজ্য স্থাপন করে। তাদের নাম অনুসারে শহরের নাম হয় রোম।

রোমের প্রথম রাজা রোমুলাস। আশপাশের আরও জায়গা জয় করে তিনি রোমকে বড় করে তোলেন।

রোমের মানুষ প্রথম থেকেই নিয়মকানুন আইনশৃঙ্খলা মানত। দুজন রোমান চাষীর মধ্যে জমি নিয়ে গণ্ডগোল বাধলে তারা মারামারি করত না। সালিশের কাছে যেত। সালিশ যা বলত তাই মেনে নিত।

রোমের মানুষ রাজাদের পছন্দ করত না। রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রোমের গণতন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। গণতন্ত্রের প্রথম দিকে দেশ শাসন করত সেনেট।

সেনেটের সদস্যরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা এক বছরের জন্য দুজন কনসাল নির্বাচন করতেন। তাঁরা শাসন কাজ চালাতেন। এঁরাও রোমকে সম্প্রসারণ করে বড় করে তোলেন। সমগ্র ইতালিকে রোমের অধীনে আনতে প্রায় দশ বছর লেগেছিল। ইতালি দখলের পর রোম ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলিতে রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। এই নিয়ে রোমের সঙ্গে কারথেজের যুদ্ধ বাধে।

রোম-কারথেজ সংঘর্ষ ঃ ভূমধ্য সাগরের তীরে উত্তর আফরিকায় কারথেজ নগর ছিল। কারথেজের লোকেরা ভীষণ যুদ্ধ করতে পারত। তারা ভাল নাবিক ছিল। তারা ছিল ব্যবসায়ীর জাত। ব্যবসার জন্য কারথেজ উত্তর আফরিকার সমস্ত উত্তর অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি, স্পেনের দক্ষিণ অঞ্চল প্রভৃতি জায়গায় বসতি স্থাপন করে এবং নিজের অধিকারে রাখে। ইতালির সিসিলি দ্বীপও তাদের অধিকারে ছিল।

রোম আর কারথেজের যুদ্ধ ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। তিনবার পিউনিক যুদ্ধ হয়। তৃতীয় বা শেষ যুদ্ধে কারথেজ হেরে যায়। রোম কারথেজ ধ্বংস করে ফেলে। একশ আঠার বছর ধরে রোম ও কারথেজের যুদ্ধ চলেছিল।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয় সিসিলির মেসেনা আর সিরাকুস শহরের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে। রোম সিরাকুসের পক্ষ নেয়। কারথেজ নেয় মেসেনার পক্ষ। যুদ্ধে কারথেজের পরাজয় হয়। শেষে কারথেজের সেনাপতি হামিলকার বারকার সিসিলি ছেড়ে স্পেনে চলে আসেন।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের কয়েক বছর পরে শুরু হল দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। কারথেজের সেনাপতি হলেন হামিলকারের পুত্র হ্যানিবল। রোমের সঙ্গে স্পেনের সীমানার গোলমাল নিয়ে হ্যানিবল যুদ্ধে নামলেন। সুশিক্ষিত পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি স্পেন থেকে ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে গিয়ে ইতালির উত্তরের আলপ্‌স পর্বত পার হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করেন। দুর্গম পথে তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়। তাঁর সঙ্গে রণহস্তীর এক বাহিনীও ছিল। ইতালির মানুষ এর আগে হাতি দেখে নি। অদ্ভুত এই জন্তুগুলো দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। হ্যানিবল পর পর কয়েকটি যুদ্ধ জয় করে রোম সীমানায় এসে পৌঁছন। কিন্তু তিনি রোমে প্রবেশ করেন নি। এই সুযোগে রোমানরা নিজেদের সৈন্যসংখ্যা বাড়ায়। তারা নৌবহর পাঠিয়ে কারথেজ দখলের চেষ্টা করে। কারথেজের সৈন্য ভয় পেয়ে শহর

রক্ষার জন্য হ্যানিবলকে দেশে ফিরিয়ে আনে। দেশে এসে রোমের হাতে তাঁর পরাজয় হয়। ধরা পড়ার আশঙ্কায় বিষ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুতে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হল।

যুদ্ধে জিতে রোম সারা স্পেন সমেত কারথেজের অধিকারভুক্ত ভূমধ্য-সাগরের সকল জায়গা দখল করল। রোম সাম্রাজ্য আরও বড় হল।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পর তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ হয়। রোম এবার আগেই ঠিক করে নিল কারথেজকে ধ্বংস করতে হবে। তারা নৌবহর পাঠিয়ে কারথেজ অবরোধ করে। কারথেজের মানুষ প্রাণপণ যুদ্ধ করেও হেরে যায়। রোমানরা নগরে প্রবেশ করে সকলকে হত্যা করে, নগরের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এইভাবে রোম কারথেজ সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে।

রোমের সমাজ ঃ পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান ঃ রাজাদের আমল থেকেই রোমের সমাজে দু'শ্রেণীর মানুষ ছিল। এরা হল পেট্রিসিয়ান আর প্লেবিয়ান। পেট্রিসিয়ানরা অভিজাত শ্রেণীর, প্লেবিয়ানরা সাধারণ মানুষ।

নির্বাচিত পেট্রিসিয়ানরা সমাজের সকল রকম সুখসুবিধা ভোগ করত। আগে রোমে কোন লিখিত আইন ছিল না। প্লেবিয়ান বা জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। সংখ্যায় কম হয়েও পেট্রিসিয়ানরা দেশকে মুঠোর ভেতর রেখেছিল। প্লেবিয়ানদের তারা নিচু জাত বলে মনে করত।

একদিক দিয়ে প্লেবিয়ানদের সুবিধা ছিল। তারা ছিল সংখ্যায় বেশি। ক্ষেত-খামারে তারা কাজ করে শস্য উৎপাদন করত। তাদের লোক সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করত। প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। তারা ভয় দেখায়—তাদের অধিকার না দিলে তারা রোম ছেড়ে চলে যাবে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল প্লেবিয়ান একবার রোম ছেড়ে আর একটা পাহাড়ে চলে যায় এবং সেখানে নতুন শহর গড়বে বলে ঠিক করে। পেট্রিসিয়ানরা ভয় পেয়ে তাদের ফিরিয়ে আনে ও প্লেবিয়ানদের অধিকার দিতে রাজি হয়। প্লেবিয়ানরা ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার অধিকার অর্জন করে। শেষ পর্যন্ত পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানরা মিলে এক রোমান জাতি গঠন করে।

নাগরিক অধিকার ঃ ইতালির সমস্ত রাজ্য রোমানরা জয় করে রোমের সঙ্গে যোগ করেছিল। বিজিত রাজ্যের নাগরিকদের রোমের নাগরিক বলে

মেনে নিয়েছিল। তাদের নিজেদের রীতিনীতি মানার অধিকার দিয়েছিল। ফলে রোমের ওপর সকলেরই শ্রদ্ধা বাড়ে এবং তারা রোমের নাগরিক হয়ে নিজেদের গর্বিত মনে করতে থাকে।

দাসপ্রথা ঃ দাসবিদ্রোহ ঃ রোমের সমাজে দাসপ্রথা ছিল। দাসপ্রথা প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। রোম গ্রীসের সংস্কৃতি যেমন গ্রহণ করেছিল, দাসপ্রথাও তেমনি চালু করেছিল।

রোমান বীরেরা যুদ্ধ করত। তাদের ঘরবাড়ির কাজ, মাঠঘাটের কাজ, কারখানার কাজ সব করত ক্রীতদাসরা। যে সকল দেশ রোম জয় করত, সেখানকার মানুষদের দাস করে নিয়ে আসত। রোমের দাসদের ভেতর নানা জাতির নানা ভাষার মানুষ ছিল। ভাল শিক্ষিত লোকও তাদের ভেতরে থাকত। রোমানদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাত দাস শিক্ষক। তাদের গ্রন্থাগারিকও (লাইব্রেরিয়ান) ছিল দাস। ঘরবাড়ির কাজে দাসরা ভাল ব্যবহার পেত। কিন্তু যাদের দিয়ে মাঠের কাজ কি কারখানার কাজ করানো হত তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। দল বেঁধে মাঠে কারখানায় তাদের নিয়ে যাওয়া হত ও ফিরিয়ে আনা হত। রাত্রিতে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত যাতে তারা পালাতে না পারে। মাথা অর্ধেক নেড়া করে রাখা হত, পালালে যাতে সহজে ধরা পড়ে। দাসদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। তাদের মেরে ফেললেও কারুর কিছু বলার বা করার ছিল না।



রোমের দাস

কেবল পরিশ্রমের কাজই দাসদের দিয়ে করান হত না। তাদের দিয়ে এক বর্বর খেলা খেলিয়ে রোমের মানুষ আনন্দ উপভোগ করত। খেলার নাম ছিল গ্লাডিয়েটরের খেলা। মানুষে মানুষে বা মানুষে ও হিংস্র পশুতে এ খেলা হত। দাসদের দিয়ে মারাত্মক এ খেলা দেখাবার জন্য রোমে অনেক স্কুল খোলা হয়েছিল যাতে দাসরা ভাল গ্লাডিয়েটর হতে পারে।

স্পারটাকাস এ রকম একটা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী ছাত্রদের বোঝালেন যে এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে মরা ভাল। অত্যাচারিত দাসরা তাঁর কথা মেনে নেয়। স্কুলের পাহারাদারদের কাবু করে তারা পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে তারা ওঠে বিসুভিয়াস পর্বতের ওপর। রোমের নানা জায়গা থেকে দাসরা দলে দলে এসে স্পারটাকাসের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের দলের লোক হয় নব্বুই হাজার। আসবার সময় তারা অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সঙ্গে এনেছিল। রোম দাসদের ধরে আনতে সৈন্য পাঠায়। যুদ্ধে রোমের সৈন্যরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। রোমে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়। কনসাল পর্যন্ত হতে কেউ রাজি হয় নি। এদিকে দাসদের সঙ্গে করে আনা খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস পেতে থাকে। অনেকে ফিরে যেতে চায়। রোম নতুন সৈন্য নিয়ে আবার দাসদের আক্রমণ করে। যুদ্ধে স্পারটাকাস নিহত হলেন। দাসদের পরাজয় হল। দুবছর দাসদের যুদ্ধ চলেছিল। ছ' হাজার দাস ধরা পড়ে। রোমের বড় রাস্তা 'এপিয়াস ওয়ে'র ওপর দাসদের ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হয়।



রোমের সৈন্য

জুলিয়াস সিজার ঃ গণতন্ত্রের অবসান ঃ গণতন্ত্রের আমলে রোম বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের শাসনে নানা সমস্যা ও গোলমালের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে তিনজনের এক পরিষদ ছিল। এর নাম হল ট্রাসভায়রেট। তিনজন সদস্য হলেন পমপি, ক্রোসাস আর জুলিয়াস সিজার। তিন জনের ভেতর জুলিয়াস সিজার ছিলেন বয়সে ছোট, তরুণ। রোমের তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সেনাপতি হিসাবেও বড় ছিলেন। গল দেশে (ফ্রান্স) বিদ্রোহ দেখা দিলে সিজারকে পাঠানো হয় বিদ্রোহ দমন করতে। অল্প কালের মধ্যেই সিজার গল দেশ জয় করে ইংলণ্ড পর্যন্ত অধিকার করেন।

সিজারের বিজয়ে রোমের মানুষ আরও বেশি করে সিজার-প্রিয় হয়ে ওঠে। ভয় পেয়ে সরকার সিজারকে দেশে ফিরতে বারণ করে দেয়। সিজার সরকারের কথা কানেও নেন নি, রোমে সসৈন্যে ফিরে এসে ক্ষমতা দখল করে নিলেন।



জুলিয়াস সিজার

দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে সিজার রাজা হতে চাইছে—এটা রটনা করা হয়। একদিন রাজপথের ওপর সিজারকে হত্যা করা হল। যে হত্যা করেছিল তার নাম ব্রুটাস। সে সিজারের একজন বন্ধু ছিল।

সিজার রাজা হন নি। তবে সিংহাসনে বসতেন, রাজদণ্ড হাতে নিতেন। কেবল রাজমুকুট মাথায় দিতেন না।

সিজারকে মেরে কিন্তু গণতন্ত্র বাঁচান গেল না। সিজারের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের জন্য আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্ষমতা অধিকার



কলোসিয়াম

করলেন সিজারের ভাগনে অকটেভিয়ান। এর পর তিনি অগাসটাস উপাধি লাভ করলেন। রোমের সেনেট তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিল। অগাসটাস

কথার অর্থ হল সর্বশক্তিমান। অগাসটাস অকটেভিয়ান রাজমুকুট মাথায় ধারণ করে রোমের প্রথম সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসলেন। গণতন্ত্রের অবসান হল। রোমের ইতিহাসে শুরু হল সম্রাটদের যুগ। সিজার নিহত হয়েছিলেন যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চুয়াল্লিশ বছর আগে। তার সতের বছর পরে অগাসটাস অকটেভিয়ান সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসেন।

সম্রাটদের আমলে রোমের চরম উন্নতি হয়। রাজধানী রোম হয় জগতের শ্রেষ্ঠ নগরী। রোম থেকে সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রান্ত পর্যন্ত তৈরি হয় বড় বড় রাস্তা, সুবৃহৎ অট্টালিকা, স্নানাগার, কলোসিয়াম প্রভৃতি। শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে রোম শীর্ষ স্থান অধিকার করে।

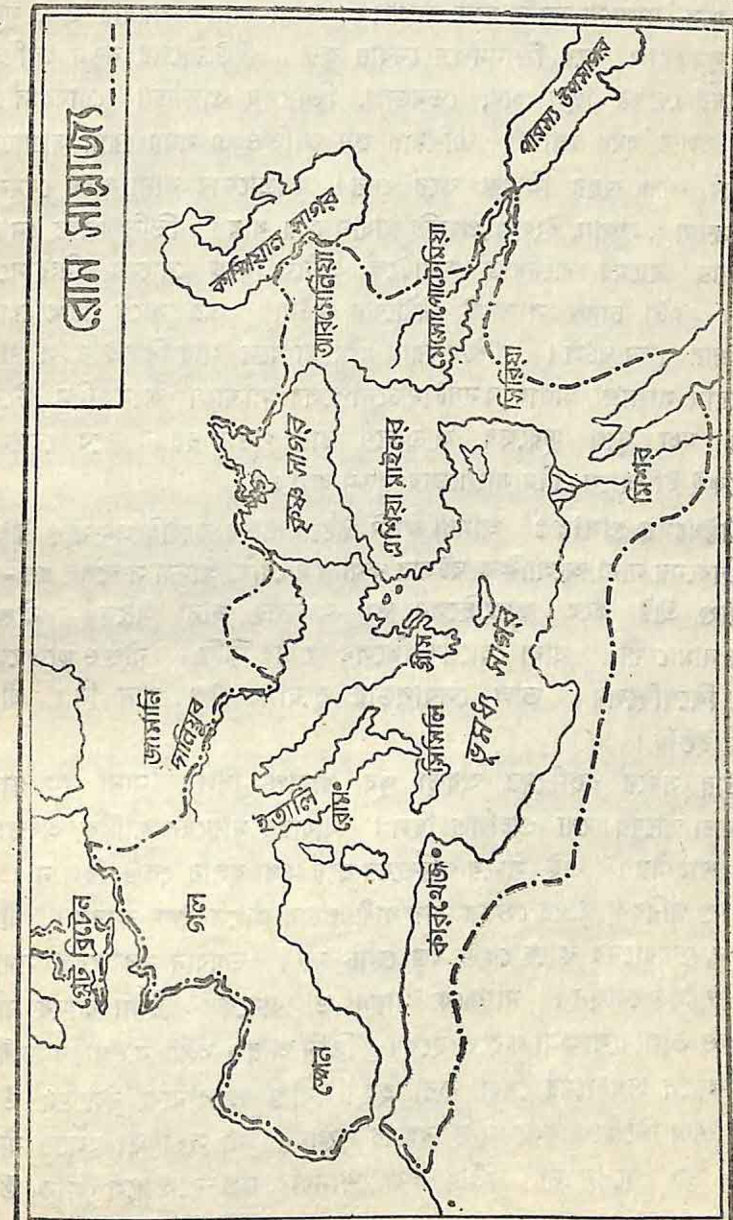
সাম্রাজ্য ঃ অগাসটাস তের বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন। তাঁর আমলে রোমে বড় বড় মারবেল পাথরের অট্টালিকা তৈরি হয়। তিনি সুশাসক ছিলেন। যে সাম্রাজ্যে তিনি প্রথম সম্রাট হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর চারশ বছর পর পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁদের ভেতর নানা চরিত্রের লোক ছিলেন। সম্রাট কালিগুলা ছিলেন অর্ধ উন্মাদ। তিনি চাইতেন প্রজারা দেবতা জুপিটারের বদলে তাঁর পুজো করুক। সম্রাট নিরো বিষ খাইয়ে নিজের মাকে হত্যা করেন। একবার আগুন লেগে রোম যখন পুড়ে ধ্বংস হচ্ছিল, সম্রাট তখন মনের আনন্দে বীণা বাজাচ্ছিলেন। খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন করেও তিনি আনন্দ পেতেন। সম্রাট ট্রোজান সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। শিল্প ও কৃষিকাজে উৎসাহ দিতেন। সম্রাট মারকাস অরিলিয়াম সাহিত্যিক ছিলেন। একজন সম্রাট মল্ল যুদ্ধ করতে ভালবাসতেন। দাস মল্ল-যোদ্ধাদের সঙ্গে মাঠে নেমে তিনি যুদ্ধ করতেন।

ইউরোপ, এশিয়া ও আফরিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল রোমের সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যের পতন ঃ এত বড় রোম সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য পরে পশ্চিম এশিয়ার বাইজানটাইন শহরে আর একটি রাজধানী স্থাপন করা হয়। রাজধানী স্থাপন করেন সম্রাট কনসটানটাইন। তাঁর নাম অনুসারে জায়গাটির নাম হয় কনসটানটিনোপল। রোম থেকে শাসন করা হত পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্য অর্থাৎ ইউরোপের অঞ্চলসমূহ। পুব দিকের অঞ্চল শাসন করা হত কনসটানটিনোপল থেকে। প্রথমে একজন সম্রাটই উভয় অঞ্চল শাসন করতেন। পরে সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে গেলে দুজন সম্রাট দু'

অঞ্চলের সিংহাসনে বসেন। সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যেমন আয়তনে কম হল তেমনি শক্তিও কমে গেল। তা ছাড়া রোমের রাজকর্মচারীদের মধ্যে নানা দুর্নীতি ছিল। দেশের স্বার্থের চেয়ে তারা নিজের স্বার্থ বড় করে



দেখত। ইতিমধ্যে ইউরোপে নতুন নতুন জাতির উদ্ভব হয়েছিল। তারা ভাল যুদ্ধ করতে পারত। রোমের সৈন্যদের আর আগের মত দেশপ্রেম ছিল না। আগে সৈনিক হত কেবল রোমের মানুষরা। সাম্রাজ্যের নানা দেশের মানুষ এসে সৈন্যদলে ভরতি হতে লাগল। তারা আসত পয়সার জন্য, যুদ্ধ শেষে লুঠতরাজ করে জিনিসপত্র নেবার জন্য। ইউরোপের নতুন জাতির লোকদের ভেতর ছিল গথ, ভেনডাল, ভিসিগথ প্রভৃতি। রোমবাসীরা এদের বলত বর্বর জাতি। এশিয়ার হুন জাতিও এ সময় রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে শহর বিধ্বস্ত করে দেয়। সাম্রাজ্যের নানা অংশ যেমন, গল (ফ্রান্স), স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন হয়ে যায়। ভিসিগথদের নেতা ওডোকার রোমের নামেমাত্র সম্রাটকে হটিয়ে নিজে রোমের সিংহাসনে বসেন। এটা চারশ সাতষট্টি খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। এর সাথে সাথে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য বলে আর কিছুই রইল না। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য অর্থাৎ কনসটানটিনোপলের সাম্রাজ্য অনেকদিন টিকে ছিল। মধ্য যুগে তুরস্কের আক্রমণে তার পতন হয়। তবে রোমের পতনকেই ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের পতন বলা হয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঃ আমরা জানি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। তাঁর জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনার কথা কম বেশি আমরা সকলেই জানি।

যীশু খ্রীষ্ট কবে জন্মেছিলেন তা সকলের জানা আছে। যীশুর মায়ের নাম মেরী। বাবা যোশেফ ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি। যীশুও ছুতোরের কাজ শিখেছিলেন। ভাল লেখাপড়ার সুযোগ যীশু পান নি। যীশু ছিলেন ইহুদি।

তাঁর সময়ে ইহুদিদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। নানা কুসংস্কার, অজ্ঞানতা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। এই সময়ে গরিবদের হয়ে কথা বলার কেউ ছিল না।

যীশু গরিব-দুঃখীদের ভেতর তাঁর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। যীশু বলতেন, ভগবানের কাছে কেউ বড় ছোট নয়। ভগবান সকলকেই সমান করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে মানুষ ভালবাসবে। হিংসা করবে না। শত্রুকেও ভালবেসে ক্ষমা করতে হবে। তিনি আরও বলতেন, গরিব দুঃখীর সেবা করলে ভগবানের সেবা করা হয়। যীশু ভগবানকে বলতেন তাঁর 'পিতা' এবং নিজেকে বলতেন ভগবানের সন্তান। যা সত্য তা বলতে যীশু কখনও ভয় পেতেন না। তাঁর কথা শোনবার জন্য দলে দলে লোক তাঁর

কাছে আসত। তাঁর জনপ্রিয়তায় ও তাঁর সহজ সরল ধর্মবিশ্বাসে প্রাচীনপন্থী ইহুদিরা তাঁর শত্রু হল এবং দেশের রাজ্যপালের কাছে নালিশ করল—যীশু লোক ক্ষেপিয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে নিজে রাজা হতে চায়। রাজ্যপাল ছিলেন রোমান। নাম পনটিয়াস পাইলেট। তিনি যীশুকে বন্দী করলেন এবং বিচারে ক্রুশে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। যে শুক্রবার দিনটিতে ক্রুশে বিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হল, সারা পৃথিবীর খ্রীষ্টানরা সেই দিনটিকে 'গুড ফ্রাইডে' বলে মানে।

এরপর আরম্ভ হল খ্রীষ্টধর্মের লোকদের ওপর অত্যাচার। কয়েক'শ বছর ধরে খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন চলে। তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। বাঘ-সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হত।

মৃত্যুর আগেই যীশু বারো জন শিষ্য রেখে যান। তাঁরা তখন নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে যীশুর ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। শিষ্যদের বলা হয় সেইনট, সন্ত বা সাধু।

রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কৃতিত্ব হল সেইনট পলের। পলের আগে নাম ছিল সল। তিনি ছিলেন এশিয়া মাইনরের ইহুদি। এক সময় তিনিও খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি আজীবন ধর্ম প্রচার করেন। তার প্রচেষ্টায় ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলণ্ড দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

রোমের সমাজেও আস্তে আস্তে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঘটে। অবশেষে সম্রাট কনসটানটাইন এই ধর্ম গ্রহণ করেন। রোম সম্রাট খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর হতে এই ধর্ম প্রচার সহজ হয়। খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়। খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্ম হওয়ায় অচিরেই জগতের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কারথেজ কোথায় ছিল? রোম ও কারথেজের ভেতর কত বার যুদ্ধ হয়?
(খ) রোমের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(গ) রোমের গণতন্ত্রের অবসান কিভাবে ঘটল?
(ঘ) রোমসাম্রাজ্যের পতন কিভাবে ঘটে?
(ঙ) খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে বিস্তার লাভ করল তার কাহিনী সংক্ষেপে বল।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) রোমের সমাজে পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হত ?
(খ) স্পারটাকাস কে ছিলেন ? দাসবিদ্রোহের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল ?
(গ) রোমের নাগরিক অধিকার কারা পেত ?
(ঘ) জুলিয়াস সিজারকে কেন হত্যা করা হয়েছিল ?
(ঙ) রোমের প্রথম সম্রাট কে ছিলেন ? শেষ সম্রাট কে ছিলেন ?
(চ) যীশু খ্রীষ্টকে কেন ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল ?
(ছ) সেইনট পল কে ছিলেন ?

৩। **বন্ধনীর ভেতর হতে শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নিয়ে বসাও ঃ**

(ক) রোম আর কারথেজের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, ইতিহাসে সেই যুদ্ধকে বলা হয়—(পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধ, পিউনিক যুদ্ধ, পারসিয়ান যুদ্ধ ।)
(খ) রোমের প্রথম সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসলেন—(জুলিয়াস সিজার, অকটেভিয়ান অগাসটাস, কনসটানটাইন ।)
(গ) রোমের নামেমাত্র সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসন অধিকার করে — (একজন গল নেতা, একজন ভিসিগথ নেতা, একজন ভেনডাল নেতা ।)

৪। **টীকা লেখ ঃ**

হ্যানিবল, স্পারটাকাস, জুলিয়াস সিজার, নিরো, কনসটানটিনোপল, বর্বর জাতি ।

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(১) রোম গড়ে ওঠে কোথায় কি নিয়ে ?
(২) রোমের প্রথম রাজার নাম কি ?
(৩) রোমের সঙ্গে কিসের দখল নিয়ে কারথেজের যুদ্ধ হয় ? ঐ যুদ্ধের নাম কি ?
(৪) সেনেট কাকে বলা হয় ? সেনেটের সদস্য হত কারা ?
(৫) হ্যামিলকার বারকা কে ছিলেন ?
(৬) রোমনরা দাসবিদ্রোহে ধৃত দাসদের কোথায় ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে ?
(৭) কনসটানটিনোপলের পত্তন করেন কে কোথায় ?
(৮) কোন দিনটিকে 'গুডফ্রাইডে' বলে ধরা হয় ?
(৯) কনসাল বলতে কি বোঝ ?
(১০) গ্লাডিয়েটর কাদের বলা হত ?
(১১) 'কলোসিয়াম' কারা কোন কাজে ব্যবহার করত ?
(১২) অ্যাম্পিথিয়েটার কি ?

'ক'-স্তম্ভের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলির সঙ্গে 'খ'-স্তম্ভের লিখিত পরিচয় মেলাও ঃ

'ক'-স্তম্ভ	'খ'-স্তম্ভ
সক্রেটিস	একজন রাজনৈতিক নেতা
হেরোডোটাস	নাট্যকার
পেরিক্লিস	দার্শনিক
সফোক্লিস	ঐতিহাসিক
আরকিমিডস	বিজ্ঞানী

৪। চীনের সাম্রাজ্য

- মহান শাঙ বংশ ঃ কনফ্যুসিয়াস
- চীনের মহাপ্রাচীর ঃ চীন সাম্রাজ্য

মহান শাঙ বংশ ঃ চীনের প্রাচীন কালের কথা এর আগে এক অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে। শাঙ রাজবংশের রাজত্বকাল হতে চীনের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়। শাঙ বংশের আর এক নাম ইন বংশ। তাদের রাজধানী ছিল আন ইয়াং শহরে। রাজধানীটি পরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জায়গাটাকে এখন ইন-এর ঢিপি বলা হয়। শাঙ বংশের রাজারা প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

আন ইয়াং শহরের ধ্বংসস্তূপ হতে শাঙ রাজাদের আমলের বহু জিনিস পাওয়া গেছে। ঐ সমস্ত জিনিসপত্র থেকে শাঙ যুগের সভ্যতার কথা জানা যায়। মাটি খুঁড়ে যে সকল জিনিস বের করা হয়েছে তার ভেতর আছে ব্রোঞ্জের এবং চীনামাটির তৈরী সুন্দর সুন্দর পাত্র। মাটির তৈরী রঙ করা নানা ধরনের পাত্রও আছে। আর আছে কাছিমের পিঠের শক্ত খোলের ওপর খোদাই করা নানা ছবি এবং চীনের চিত্রাক্ষরে লেখা অনেক কথা। কাছিমের পিঠের ছবি দেখে চীনের দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যৎ বলতে পারত। চীনের লোক যে তখনও পূর্ব পুরুষদের পূজা করত তাও জানা যায়।



প্রাচীন চীনের ব্রোঞ্জের পাত্র

শাঙ রাজারা শেষের দিকে অযোগ্য ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এক বিদ্রোহের ফলে শাঙ বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং চৌ বংশের রাজত্ব শুরু হয়। চৌ বংশের লোকেরা ছিল পশ্চিম চীনের চৌ রাজ্যের।

শাঙ রাজারা বিপুল অর্থব্যয় করে নিজেদের সমাধি মন্দির তৈরী করতেন। মাটির চল্লিশ ফুট (প্রায় তের মিটার) নিচে তাঁদের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে।

চৌ রাজারা প্রায় ন'শ বছর রাজত্ব করেছিলেন। চৌ রাজাদের আমলে চীন অনেক বিষয়ে উন্নতি করে। কৃষির উন্নতি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়, শিল্প ও হাতের কাজের বিশেষ উন্নতি হয়। চৌ রাজত্বকালকে স্বুবর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে।

দীর্ঘকাল রাজত্বের পর চৌ বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। চীনের জমিদাররা স্বাধীন হয়ে কয়েক হাজার ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের ভেতর ঝগড়া মারামারি চলতে থাকে। শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়।

কনফুসিয়াস ঃ চীনের মহাপুরুষ কনফুসিয়াস এই সময় জন্মগ্রহণ করেন। কনফুসিয়াসের আগের নাম ছিল কং-ফুৎ-সি। কনফুসিয়াস নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচশ বছর আগে চীনের শানটুং প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পয়সার অভাবে বাল্যে ভাল লেখাপড়া করতে পারেন নি। তবে পড়াশোনার আগ্রহ ছিল। নিজের প্রচেষ্টায় পড়াশোনা করে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালাবার জন্য তিনি বাড়িতে একটা বিদ্যালয় খোলেন। এখানে কাব্য ইতিহাস দর্শন নীতিশাস্ত্র পড়াতেন। অনেক বড় ঘরের ছেলে এবং রাজকুমারও তাঁর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিল।



কনফুসিয়াস

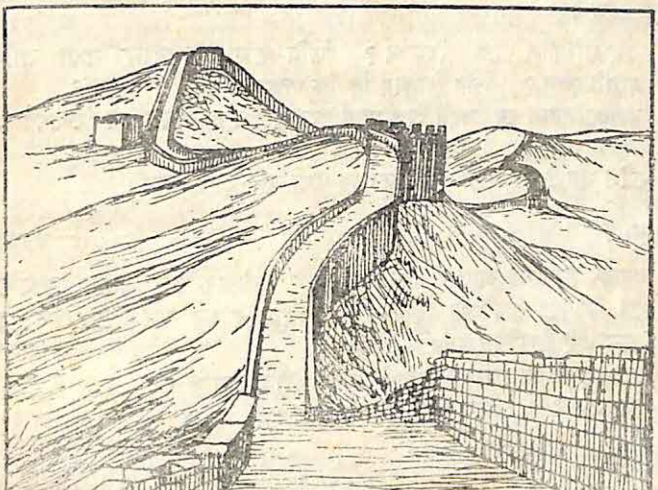
দেশে তখন প্রায় অরাজক অবস্থা। শান্তিশৃঙ্খলা বলে কোনকিছু ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ প্রাণ নাশ নিত্যকারের ঘটনা ছিল। দেশের অরাজকতা দূর করার জন্য কনফুসিয়াস কতকগুলো নীতি রচনা করলেন। তাঁর নীতির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল, স্বার্থত্যাগ এবং চরিত্র গঠন। সৎ চরিত্রের না হলে কোন কিছুই করা যায় না।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কনফুসিয়াসের নৈতিক আদর্শ চীনের প্রাচীন শিংটু ধর্মের সাথে মিশে এক নতুন ধর্মের রূপ পায়।

চৌ বংশের আমলের পর তিরিশ বছর ধরে চীনে প্রচণ্ড অরাজকতা চলে। ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ হয়। শেষে শি-হোয়াং টি ক্ষমতা লাভ করেন। শি-হোয়াং টি চীনের সমস্ত রাজ্য জয় করে চীনে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। নিজে হন প্রথম সম্রাট। শি-হোয়াং টি ছিলেন চিন বংশের। অনেকে মনে করে, তাঁর বংশের নাম হতে দেশের নাম চীন হয়।

শি-হোয়াং টি ছিলেন চীনের শক্ত মানুষ। তিনি চাইতেন কাজ। লেখাপড়া তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর কাজের সমালোচনা করার জন্য তিনি কনফুসিয়াসের লেখা সমস্ত বই এবং প্রাচীন চীনের অন্যান্য দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

চীনের মহাপ্রাচীর ঃ শি-হোয়াং টি চীনের মহাপ্রচীরের নির্মাণ কার্য শেষ করেন। তাঁর প্রায় একশ বছর আগে মহাপ্রাচীর গাঁথার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। চীনের উত্তর দিক থেকে মোঙ্গল, হূণ প্রভৃতি জাতি বার



চীনের মহাপ্রাচীর

বার চীন আক্রমণ করত। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পুবের সমুদ্র তীর হতে চীনের সমগ্র উত্তর দিক বেড় দিয়ে মহাপ্রাচীর গাঁথা হয়। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য চোদ্দ'শ মাইলের (দু হাজার আড়াই'শ কিলোমিটারের) বেশি। উচ্চতা পঁচিশ ফুট (প্রায় আট মিটার) এবং চওড়া পনের ফুট

(প্রায় পাঁচ মিটার)। ওপরে মাঝে মাঝে গম্বুজ ছিল। সৈন্যসামন্তদের থাকবার জায়গা ছিল। চীনের মহাপ্রাচীরের কিছু অংশ এখনও টিকে আছে।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য শি-হোয়াং টি জোর জবরদস্তি করে মানুষ খাটাতে থাকেন। কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষের প্রাণ যায়। বলা হয়, প্রাচীরে যতগুলো পাথর ততগুলো মানুষ প্রাচীর গাঁথার কাজে জীবন হারিয়েছিল।

জবরদস্তির ফলে এবং প্রাচীন বইপত্র নষ্ট করার জন্য চীনের মানুষরা শি-হোয়াং টির ওপর বিরক্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বংশের রাজত্বের অবসান ঘটল।

এরপর চীনে হান বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তিনি কোথায় কোন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন? তাঁর শিক্ষার কি কি লক্ষ্য ছিল?
২। কনফুসিয়াস যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময় চীন দেশের অবস্থা কেমন ছিল?
৩। চীন সম্রাটদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা সবিস্তারে লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কনফুসিয়াসের আগের নাম কি ছিল? তাঁকে চীনের মানুষ জানত কেন?
২। কে চীনের প্রাচীরের নির্মাণ কার্য শুরু করেন ও কে তা শেষ করেন? কেন এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়?
৩। চৌ-বংশের রাজত্বকালে চীনে কি কি উন্নতি হয়?
৪। শি-হোয়াং টি কেমন সম্রাট ছিলেন বল।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থানে কথা বসাও ঃ
(ক) শাঙ বংশের অপর নাম ছিল —।
(খ) শাঙ বংশের রাজধানীর নাম ছিল —।
(গ) — পিঠে যে অক্ষর দেখা যেত তা দেখে চীনের দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যৎ বলতে পারত।
(ঘ) — রাজত্বকালকে চীনের সুবর্ণযুগ বলত।
(ঙ) শি-হোয়াংটি ছিলেন — বংশের লোক।

৫। ভারত-কথা

● আর্যদের আগমন ● বেদ ● আর্যদের সমাজব্যবস্থা
● মহাকাব্য ঃ রামায়ণ মহাভারত ● জৈনধর্ম ঃ বৌদ্ধধর্ম
● সাম্রাজ্য ঃ মৌর্য-কুষাণ-গুপ্ত ● প্রাচীন বাংলার কথা
● বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ● বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ
● প্রাচীন ভারতের শিল্প-শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান

আর্যদের আগমন ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে প্রায় চার হাজার বছর আগে একদল মানুষ ভারতে আসতে থাকে। এদের গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ। নাক উঁচু। লম্বা চেহারা। আগে এরা মধ্য এশিয়ায় বাস করত। এরা নিজেদের বলত আর্য। তখন ভারতে কালো মানুষেরা বাস করছিল, আর্যরা তাদের নাম দিল অনার্য। আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করে পাঞ্জাবের সরস্বতী নদীর ধারে।

অনার্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে প্রথমে পাঞ্জাব এবং ক্রমে ভারতের নানা জায়গা আর্যরা দখল করল। পরাজিত অনার্যদের কিছু গেল বনেজঙ্গলে পালিয়ে। বাকিরা আর্যদের দাস হয়ে তাদের সঙ্গে থেকে গেল। যারা বনেজঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল, এখনকার কোল ভিল সাঁওতালরা হল তাদের বংশধর।

বেদ ঃ আর্যদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় বেদ থেকে। বেদ আর্যদের ধর্মগ্রন্থ। বেদ কথার অর্থ জ্ঞান। বেদ পৃথিবীর সব চাইতে পুরানো বই। এর ভাষা আর্যভাষা—সংস্কৃত। আগে বেদ লিখিত ছিল না। ব্রাহ্মণরা বেদ মুখস্ত করে রাখতেন। গুরুরা শিষ্যদের বেদ শোনাতেন। শিষ্যদেরও শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে যেত। শিষ্য যখন গুরু হতেন তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের মুখে মুখে বেদ শোনাতেন। শুনে শুনে শেখা হত বলে বেদের আর এক নাম শ্রুতি।

বেদের চারটি ভাগ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। প্রতিটি বেদের আবার চারিটি খণ্ড। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্। বেদের মন্ত্র, স্তোত্র প্রভৃতি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের বলা হয় ঋষি। হিন্দুরা মনে করে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কেউ রচনা করে নি; বেদ ভগবানের মুখের বাণী।

বেদ বোঝবার সুবিধার জন্য ঋষিরা বেদাঙ্গ লেখেন। বেদাঙ্গ ছটি—শিক্ষা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ।

বেদের মধ্যে ঋক্ বেদ সব চাইতে পুরানো। পরে উপনিষদ্ রচিত হয়। এতে আছে দর্শনের কথা। এগুলিকে অনেকে বেদের সহজ ব্যাখ্যা বলে মনে করেন।

আর্যদের সমাজব্যবস্থা ঃ বেদ থেকে আর্যদের কথা সব জানা যায়। প্রথম তারা ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত ছিল। তাদের ভেতর কোন জাতি-ভেদ ছিল না। পরে বৃত্তি বা যে যেমন কাজ করত তার ওপর ভিত্তি করে তাদের ভেতর চারটি জাতি গড়ে উঠল। এগুলির নাম বর্ণ। যাঁরা পড়াশোনা, পূজোপাঠ করতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। যুদ্ধ ও দেশ শাসন যারা করত তারা হল ক্ষত্রিয়। বাকি আর্যরা সবাই হল বৈশ্য। যে সব অনার্যরা আর্যদের কাজকর্ম করে দিত, তাদের সেবা করত, তারা হল শূদ্র।

আর্যদের জীবন চার ভাগে বা আশ্রমে ভাগ করা ছিল। একে বলা হত বর্ণাশ্রম। বাল্যে এবং কৈশোরে গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে হত। এ সময়কে বলা হত ব্রহ্মচর্য আশ্রম। শিক্ষাশেষে ঘরে ফিরে সংসারী জীবন যাপনের নাম হল গার্হস্থ্য আশ্রম। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ছেড়ে সস্ত্রীক বনে গিয়ে বাস করার নিয়ম ছিল। তখন তাকে বলা হত বাণপ্রস্থ। এর পর বুড়ো বয়সে কেবল ভগবানের নাম করে জীবন কাটানোর নাম হল সন্ন্যাস।

আর্যসমাজে নারীদের স্থান ছিল উঁচু। নারীরা সম্মান ও শ্রদ্ধা পেত। আর্যরা যজ্ঞ করার সময় স্ত্রীকেও সঙ্গে নিত। নারীরা ঘরের কর্ত্রী ছিল। তারা লেখাপড়াও শিখত। বেদের স্তোত্র রচনা করে কয়েকজন নারী ঋষি হয়েছিলেন। এঁদের ভেতর ছিলেন অপলা, ঘোষা, বিশ্বরবা। গার্গী নামে আর একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন।

আর্যদের ধর্ম ঃ আর্যরা আদিতে প্রকৃতির উপাসনা করত। প্রকৃতির শক্তির বিভিন্ন বিকাশকে দেবদেবী জ্ঞানে তারা বন্দনা করত। উষা, সরস্বতী, বায়ূ, অগ্নি, মিত্র বা সূর্য প্রভৃতি আর্য-দেবদেবীর নাম। স্বর্গের দেবতার নাম দ্যৌঃ, বজ্রবৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ।

ভগবানকে আর্যরা বলে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কোন রূপ বা অবয়ব নেই।

দেবদেবীকে তুষ্ট করার জন্য আর্যরা যজ্ঞ করত। যিনি মন্ত্র পাঠ করতেন তাঁকে বলা হত হোতা। বেদে কোন মন্দির বা মূর্তির কথা নেই।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ আর্যদের কয়েকটি পরিবার মিলে হত গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হত 'বিশ' বা 'জন'। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি গৃহস্বামী। গ্রামের প্রধানকে গ্রামীন আর বিশ-এর প্রধানকে বলা হত বিশপতি। বিশপতিরা রাজা হিসাবে তার অঞ্চল শাসন করত। রাজ্য শাসনের জন্য বিশপতি, পুরোহিত, প্রধান সেনাপতি এবং গ্রামীনদের পরামর্শ নিত। রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য 'সভা' ও 'সমিতি' অনেক জায়গায় থাকত। রাজা মারা গেলে রাজার ছেলে রাজা হত।

মহাকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারতকে বলা হয় মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প ছেলেবেলা থেকে মা-ঠাকুরমার কাছে তোমরা শুনে আসছ। রামায়ণ ও মহাভারতের কোনখানা আগে লেখা হয়েছিল তাও ঠিকভাবে কেউ জানে না। তবে ধরে নেওয়া হয়েছে, রামায়ণ রচনা হয়েছিল আগে।

রামায়ণ রচনা করেছেন মহর্ষি বাল্মীকি। এতে আছে অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্রের কাহিনী। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য চোদ্দ বছরের জন্য তাঁর বনে গমন, স্ত্রী সীতাকে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক চুরি, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামের অযোধ্যায় ফিরে আসা প্রভৃতি নানা কাহিনী। রামায়ণের রামচন্দ্র, হনুমান, সীতা ইত্যাদি প্রতিটি আদর্শ চরিত্র।

মহাভারত রচনা করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহাভারতের মূল কথা হল হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভের জন্য জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইদের ভেতর যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবি নানা কাহিনী নানা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মহাভারত পৃথিবীর বৃহত্তম কাব্য গ্রন্থ। এতে এক লক্ষ বিশ হাজার শ্লোক আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র, সীতা দেবতারূপে পূজা পেয়ে থাকেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের দেবতা। মহাভারত ও রামায়ণের চরিত্রগুলি এখনো ভারতের জনজীবন অনুপ্রাণিত করে। কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ঃ বেদের ধর্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদে ভারতে যে দুটি ধর্মমত প্রচলিত হয় তার একটি হল জৈনধর্ম, অপরটি বৌদ্ধধর্ম।

মহাবীর ঃ জৈন ধর্ম প্রচার করেন মহাবীর। তাঁর আগের নাম ছিল বর্ধমান। বৈশালীর এক রাজার ছেলে ছিলেন বর্ধমান। তাঁর জীবনের কথা বেশি জানা যায় নি। তাঁর জন্ম বা মৃত্যু কবে হয়েছিল

সঠিকভাবে কেউ তা বলতে পারে নি। তিরিশ বছর বয়সে বর্ধমান সংসার ত্যাগ করেন। তিনি বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যা করে তিনি কৈবল্য বা পরম-জ্ঞান লাভ করেন এবং জিন হন। জিন কথার অর্থ যিনি সবকিছু জয় করেছেন। বীরের মত সংগ্রাম করে দুঃখকষ্ট জয় করেছিলেন বলে তিনি হলেন মহাবীর।


মহাবীর

মহাবীরের প্রচারিত ধর্মের নাম হল জৈনধর্ম। যারা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা হল জৈন। জৈনরা বেদ মানে না। তারা বলে, তাদের ধর্ম বেদের চেয়েও পুরাতন। জৈনরা তাদের ধর্ম-গুরুকে বলে তীর্থঙ্কর। মহাবীর হলেন শেষ তীর্থঙ্কর। তাঁর আগে আরও তেইশ জন ধর্মগুরু বা তীর্থঙ্কর এসেছিলেন। পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথও ছিলেন একজন জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর।

মহাবীর বাহাত্তর বছর বয়সে বিহারের পাবা গ্রামে দেহত্যাগ করেন। পাবা গ্রাম জৈনদের একটি তীর্থক্ষেত্র।

মহাবীর বেদ মানতেন না। তাঁর ধর্মের মূল নীতি হল অহিংসা। জৈনদের মতে, প্রাণীহত্যার মত বড় পাপ আর নেই। জৈনদের বিশ্বাস, গাছপালা এমনকি পাথরেরও প্রাণ আছে। জৈনধর্মের আদর্শ হল, সদা সত্য কথা বলা, পরের সম্পত্তিতে লোভ না করা, ইন্দ্রিয় দমন করা, চুরি না করা আর সরল জীবন যাপন করা।

বৌদ্ধধর্ম ঃ বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার নাম বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধ-দেবের পিতা শুদ্ধোদন শাক্য বংশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধের প্রথম নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁকে গৌতমও বলা হত। তাঁর জন্ম হয় নেপালের লুম্বিনীতে। সিদ্ধার্থ অল্প বয়স হতেই ছিলেন গম্ভীর ও ভাবুক। তিনি রাজবাড়ির ছেলেদের মত আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটাতে চাইতেন না। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম যশোধরা। ঊনতিরিশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্র হয়। পুত্রের নাম রাহুল।

পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলেন। সন্ন্যাসী

হয়ে অনেক পণ্ডিতের কাছে অনেক দিন ঘুরলেন। এর পর কঠোর তপস্যায় তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। এই সময় সুজাতা নামে এক মহিলা তাঁকে পায়েস খেতে দেন। পায়েস খেয়ে সিদ্ধার্থ সুস্থ হলেন। পরে নিকটের নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে আবার ধ্যানে বসলেন। এবার সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ হল। ধ্যানে তিনি পরম জ্ঞানলাভ করলেন। এর পর হতে তাঁর নাম হল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। এই স্থানটির নাম এখন হয়েছে বুদ্ধগয়া।

সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধ কাশী গেলেন। সেখানে মৃগদাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে তিনি প্রথম শিষ্য করলেন। মৃগদাব অর্থাৎ হরিণবন হল কাশীর কাছে সারনাথে। এখানেই তাঁর ধর্মপ্রচার প্রথম আরম্ভ হল।



বুদ্ধদেব

বুদ্ধ জাতি বিচার করতেন না। তিনি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতেন। জনসাধারণের ভাষা বা পালি ভাষায় তিনি ধর্ম প্রচার করতেন। লোকেরা তাতে ভাল বুঝতে পারত। তিনি ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতেন। আশি বছর বয়সে বুদ্ধ কুশীনগরে দেহত্যাগ অর্থাৎ মহানির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি হল—দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ভোগ-বিলাস করলে চলবে না, শরীরকে কষ্ট দিলেও মুক্তি আসবে না। এর জন্য দরকার মধ্যম পন্থার। তা সম্ভব হবে আটটি নিয়ম মেনে চললে। নিয়মগুলো হল—সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎসংকল্প, সৎস্মৃতি, সম্যকদৃষ্টি ও সম্যকসমাধি। বৌদ্ধধর্মে এর নাম অষ্টমার্গ। অহিংসা এবং জীবে দয়া বৌদ্ধ-ধর্মের মূল কথা। বৌদ্ধরা বেদ বিশ্বাস করে না।

বুদ্ধদেব নিজে কিছু লিখে যান নি। তাঁর তিরোধানের পর শিষ্যরা তাঁর উপদেশ সংগ্রহ করে লিখে রাখে। উপদেশগুলো হল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এর নাম ত্রিপিটক।

সাম্রাজ্য : প্রাচীনকালে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আমলে উত্তর ভারতে

ষোলটি রাজ্য ছিল। এদের বলা হত মহাজনপদ। ষোলটির চারটি রাজ্য —অবন্তি, কোশল, বৎস ও মগধ ছিল প্রধান। মগধ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বাকি মহাজনপদগুলো জয় করে নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

বুদ্ধদেবের সময় মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। অঙ্গরাজ্য তিনি জয় করেন এবং কাশীরাজ্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করে কাশীরাজ্য যৌতুক স্বরূপ পান। ফলে মগধ সবচেয়ে বড় রাজ্য হয়। তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা রাজগীর। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু বৈশালী রাজ্য জয় করেন। তাঁর আমলে মগধ, অঙ্গ, কাশী ও বৈশালী এক হয়ে বড় রাজ্য হয়। অজাতশত্রুর বংশের রাজত্বের পর শিশুনাগ রাজা হয়েছিলেন। তিনি অজাতশত্রুর বংশের লোক ছিলেন না। শিশুনাগ অবন্তী জয় করে মগধকে আরও বড় করেন। শিশুনাগবংশের রাজাকে বধ করে মগধের রাজা হন মহাপদ্মনন্দ। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে মহাপদ্মনন্দ সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন। মহাপদ্মনন্দ সমস্ত জনপদ বা রাজ্য একত্র করে মগধে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মহাপদ্মনন্দ ও তাঁর আট পুত্র পর পর মগধে রাজত্ব করেছিলেন।

অজাতশত্রুর সময় রাজগৃহ হতে পাটলীপুত্র নগরে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

মৌর্য বংশ ঃ নন্দবংশের শেষ রাজার নাম ধননন্দ। তিনি ছিলেন ঘোর স্বার্থপর আর ভয়ানক অত্যাচারী। দেশের লোক তাঁর ধ্বংস কামনা করত। জনসাধারণের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। নন্দবংশ ধ্বংস করে তিনি পাটলীপুত্র অধিকার করেন।

নন্দরাজার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ ছিল। ঠিক এই সময় আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারত অভিযান করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক যুদ্ধ প্রণালী শেখবার জন্য আলেকজাণ্ডারের শিবিরে যান। সুযোগ না পাওয়ায় পালিয়ে আসেন। তিনি বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং চাণক্যের পরামর্শে মগধ অধিকার করেন। ফলে মগধের বিশাল সেনাবাহিনী আর অগাধ অর্থ তাঁর হাতে এল। চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী। চাণক্য তাঁর কূটনীতিবিষয়ক গ্রন্থ 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' লিখে বিখ্যাত হন।

ইতিমধ্যে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার মারা গিয়েছেন। তাঁর এক সেনাপতি সেলুকাস গ্রীক সাম্রাজ্যের ভারতের অংশ ভাগে পেয়েছিলেন। সেলুকাস ভারত আক্রমণ করেন কিন্তু যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের কাছে হেরে গিয়ে নিজের রাজ্যের

অংশ কাবুল, কান্দাহার, বেলুচিস্তান, হিরাট ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। কথিত আছে, সেলুকাস নিজের মেয়ে হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের সাথে বিয়ে দেন আর মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীকদূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠান। এর পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতের দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হলেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। পিতার মত তাঁর যোগ্যতা ছিল না, সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। এর মধ্যে কলিঙ্গ একটি। কলিঙ্গের কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। বিন্দুসার সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

বিন্দুসারের পর সম্রাট হলেন তাঁর পুত্র অশোক। অশোক কেবল ভারতের সম্রাটদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর মহাপুরুষদেরও অন্যতম।


সম্রাট অশোক

কলিঙ্গ দেশ সাম্রাজ্য হতে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাজ্য হয়েছিল। অশোক সম্রাট হয়ে প্রথমেই চাইলেন কলিঙ্গ জয় করে সাম্রাজ্য বাড়াতে। বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তিনি কলিঙ্গ অভিযান করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল। অশোক জয়ী হলেন। কিন্তু যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা দেখে তিনি অন্তরে বড় আঘাত পেলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ সৈন্য নিহত হয়, দেড় লক্ষ হয় বন্দী। যুদ্ধে দেশের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে অগণিত মানুষ অনাহারে, রোগে এবং আরও নানাভাবে মরতে থাকে। যুদ্ধের কুফল দেখে অশোক প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি আর যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন না। তিনি শান্তির নীতি মেনে চলবেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তখন থেকে তাঁর কাজ হল জীবে দয়া ও জীবে সেবা। প্রজাদের তিনি নিজের ছেলের মত ভাবতেন। রাজকর্মচারীদের

দিয়ে গরিব লোকদের সাহায্য করতেন। পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার দু'ধারে গাছ পুঁতে, জলের জন্য কুয়ো খুঁড়ে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন।



অশোক স্তম্ভ

প্রজাদের উন্নতির জন্য অশোক নানা ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তারা যাতে ভাল ভাবে থেকে সৎ-জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য তিনি অনেক শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও গুহালিপিতে ভাল ভাল উপদেশ খোদাই করেছিলেন। বর্তমান ভারতের জাতীয় প্রতীক সারনাথের অশোক স্তম্ভ হতে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় শিলালিপি লেখা হত। শিলালিপি প্রভৃতিতে বেশির ভাগই ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করা হত।



ব্রাহ্মীলিপি

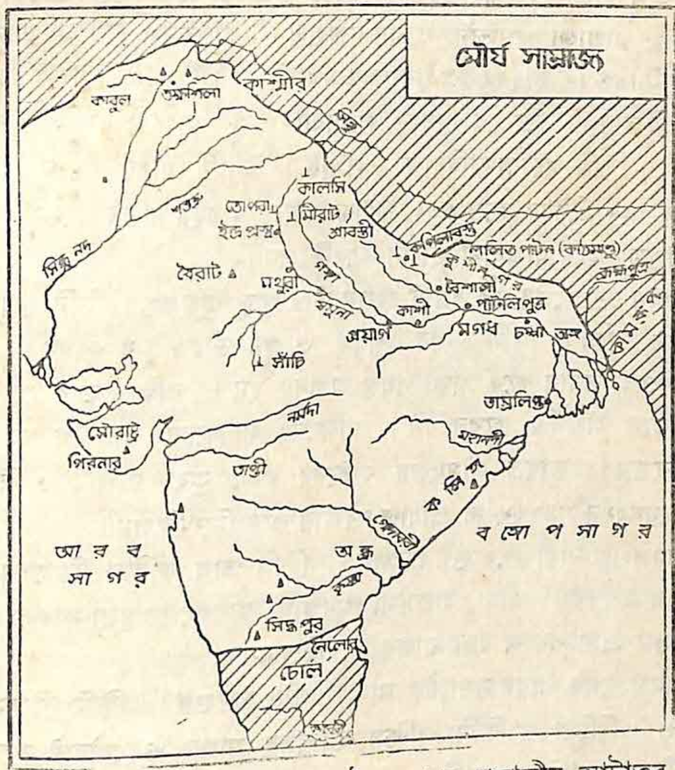
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক ধর্মমহামাত্র নামে নতুন একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। দেশবিদেশে লোক পাঠিয়ে তিনি ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

হিমালয় থেকে শুরু করে সুদূর দক্ষিণের কিছু অংশ বাদে আফগানিস্তান সহ সমগ্র উত্তর ভারত এবং পূর্ববঙ্গের কিছু অঞ্চল ছাড়া সমস্ত পূর্ব ভারত অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মানচিত্র দেখে বুঝতে পারবে মৌর্য সাম্রাজ্য কত বড় হয়েছিল।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

কুষাণ যুগ ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন কোন বিদেশী জাতি ভারতে আসে এবং ভারতের অনেক জায়গা অধিকার করে। বিদেশীদের ভেতর কুষাণ নামে এক জাতি ছিল। আগে কুষাণরা চীনের সীমান্তে বাস করত। ভারতে এসে তারা ভারতীয় হয়ে যায়। কুষাণ রাজা দ্বিতীয়

কদফিস কাশী পর্যন্ত অধিকার করে উত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্য গড়েন। কুষাণদের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার।



কুষাণ রাজাদের ভেতর কণিষ্ক শ্রেষ্ঠ। প্রথম শতাব্দীর আটাত্তর সালে তিনি সিংহাসনে বসেন। তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু প্রদেশের উত্তর অংশ এবং মগধ জয় করেছিলেন। পারস্য এবং চীনের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি মধ্য এশিয়ার খোটান, ইয়ারখন্দ এবং কাসগড় জয় করে তা সাম্রাজ্যের সামিল করেন। তার আগে বা পরে কোন ভারতীয় রাজা ভারতের বাইরে এতদূর সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেন নি।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নানা ভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় এবং সেখানে অনেক মঠ ও স্তূপ নির্মিত হয়।

কণিষ্ক তেইশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরের সম্রাটরা শক্তিশালী ছিলেন না। ফলে সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং ভারতে অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর বেশ কিছু দিন ভারতে আর কোন বড় রাজ্য বা সাম্রাজ্য ছিল না। চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ আবার বড় হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। মগধের সাম্রাজ্য গড়েন গুপ্ত সম্রাটরা।

গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত। ইতিহাসে ইনি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ মগধের নিকট ছোট একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মগধ, অযোধ্যা এবং প্রয়াগ জয় করে রাজ্য বৃদ্ধি করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ (সম্রাট) উপাধি ধারণ করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি পাটলীপুত্র শহরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হলেন তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। তিনি গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারত জয় করেন। দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করে কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতকে তিনি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন নি। দক্ষিণের রাজাদের কাছ থেকে কেবল কর নিতেন। ভারত সীমান্তের বাইরের শক, কুষাণ রাজারা ও সিংহলের রাজা মেঘবর্মন সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত নানা গুণে গুণী ছিলেন। তিনি ভাল কবিতা লিখতেন, ভাল বীণা বাজাতেন। বীণা বাজানো অবস্থায় সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সমুদ্রগুপ্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পরের সম্রাটের নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত। তিনি পশ্চিম ভারতের মালব ও সৌরাষ্ট্র হতে দুর্ধর্ষ বিদেশী শকজাতিকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গা দুটি অধিকার করেন। তিনি শকদের রাজধানী উজ্জয়িনী দখল করেন। উজ্জয়িনীতে তিনি আর একটি রাজধানী স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুটি রাজধানী হয়। নর্মদা নদীর দক্ষিণ দিকের বাটক রাজ্যের রাজার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশ সুরক্ষিত করেন।

অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কবি কালিদাস, জ্যোতিষী বরাহমিহির, কবি বররুচি প্রভৃতি নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের বলা হয় নবরত্ন।

পরের সম্রাট কুমারগুপ্ত। তাঁর অন্য উপাধি মহেন্দ্রাদিত্য। তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য পুবে বঙ্গদেশ

থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত সাম্রাজ্য তাঁর আমলেই সর্বাপেক্ষা বড় হয়।



বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

পরের সম্রাট স্কন্দগুপ্তকে প্রায় সারা জীবন যুদ্ধ করে কাটাতে হয়। তিনি ছিলেন মহাবীর। দক্ষিণের পুষ্যমিত্র নামে উপজাতিদের তিনি পরাজিত করেন। তারপরই আরম্ভ হয় হূণদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ। বহুকাল যুদ্ধ করে তিনি হূণদের পরাজিত করেন এবং ভারতকে অসভ্য হূণ আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। তিনি কেবলমাত্র বারো বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। গুপ্ত বংশের তিনিই ছিলেন শেষ শক্তিশালী সম্রাট। তাঁর মৃত্যুর পর হতে গুপ্ত বংশের মহিমা লোপ পায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের ভেতর ছিলেন পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত প্রভৃতি। এঁরা কেউই শক্তিশালী ছিলেন না। প্রথম দিকে গুপ্তরাজারা হূণদের বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে আর তাদের রোধ করতে পারলেন না। হূণ নেতা তোরমান এবং মিহিরকুল ভারতের অনেক অঞ্চল দখল করে রাজ্য স্থাপন করেন। এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

প্রাচীন বাংলার কথা ঃ এখনকার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চল নিয়ে প্রাচীনকালের বাংলা দেশ গঠিত ছিল। তবে সমগ্র দেশের নাম তখন বাংলা বলা হত না। তখন এই দেশ ছিল কতকগুলি জনপদে বিভক্ত। এক এক কৌম বা গোষ্ঠীর মানুষ এক এক জনপদে বাস করত। তাদের আলাদা আলাদা রাষ্ট্র ছিল, আলাদা শাসনব্যবস্থা ছিল। সমগ্র দেশের নাম বাংলা হয় মোগল সম্রাট আকবরের সময় হতে। সুবে বাংলা তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। প্রথমে পর্তুগীজরা 'বাঙ্গাল' এবং পরে ইংরেজরা দেশের নাম দেয় 'বেঙ্গল' বা 'বাংলাদেশ' ;

প্রাচীন যে সমস্ত জনপদ নিয়ে এ দেশ গঠিত ছিল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল—বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বলতে বোঝাত কেবল পুণ্ড্র, গৌড় ও বরেন্দ্রী অঞ্চল।

আর্যরা এদেশে এসেছিল সব শেষে। এদেশে বাস করতে তারা পছন্দ করত না। বলত এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মহাভারতে তাম্রলিপ্তির কথা আছে। বৃহৎ সংহিতায় উপবঙ্গ জনপদের উল্লেখ আছে। উপবঙ্গ এখনকার যশোর-চব্বিশ পরগণার কোন অঞ্চলে ছিল। জৈন ধর্মপুস্তকে রাঢ় দেশের কথা পাওয়া গেছে। মহাবীর সশিষ্য রাঢ়দেশে এসেছিলেন। দেশের লোকরা ছিল অত্যন্ত রূঢ়। তারা সন্ন্যাসীদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারাষ্ট্র নামে একটা দেশ ছিল। গ্রীকরা এর নাম দিয়েছিল গঙ্গারাইডি। গঙ্গারাইডির বীর যোদ্ধাদের ভয়ে গ্রীকরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহসী হয় নি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের আমলে পূর্ববঙ্গ বাদে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ছিল। গুপ্তযুগেও কেবল সমতট অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। বাংলার শাসন ব্যাপারে গুপ্ত সম্রাটরা বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। সম্রাট নিজে এই দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ ছিল তখনকার শাসনকেন্দ্র। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা স্বাধীন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের আগে পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অংশে নানা গোষ্ঠীর লোক বাস করত। তাদের ভাষা ছিল এক। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মানুষ নিয়ে বাঙালী জাতি। এখনকার সমাজে যারা হাড়ি, ডোম, রাজবংশী, চণ্ডাল, বাগদী, তাদের পূর্বপুরুষরাই ছিল প্রাচীন বাংলার বাসিন্দা।

বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ : বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ শুরু হয় আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় থেকে। গ্রীকরা তখন জানতে পারে ভারতের উন্নত সভ্যতার কথা। গ্রীসের সাথে যোগাযোগের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক নতুন শিল্পরীতি প্রচলিত হয়। এর নাম গান্ধার-শিল্প। গ্রীক এবং ভারতীয় শিল্প থেকে গান্ধার শিল্পের জন্ম হয়।

সম্রাট অশোক ভারতের বাইরে সুদূর মিশর, সিরিয়া, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশে এবং সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। ফলে এই সমস্ত দেশের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ সমেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর নাম ছিল সুবর্ণভূমি। সম্রাট কণিষ্কের আমলে ভারত সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার কাশগড়,

ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতীয়রা এখানে গিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করত। খোটানের চারপাশে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির তলায় সে যুগের ভারতীয় শহরগুলি চাপা পড়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেলস্টাইন মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতের ভাষা ও বর্ণমালার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন। সপ্তম শতকে চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে আসবার সময় এখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতের মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করে এবং রাজ্য স্থাপন করে। মালয়, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, বালি প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশ এবং রাজ্য ছিল। ভারতের বৌদ্ধধর্ম এবং শৈবধর্ম এখানে প্রচলিত ছিল। এখানকার আচার ব্যবহার এবং লোকজনের নামে এখনও ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাইরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। লোকের আর্থিক উন্নতি হয়। যেখানে ভারতের লোকেরা গিয়ে বসবাস করত সেখানের মানুষরাও ভারতের উচ্চ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজের সভ্যতা উন্নত করার সুযোগ পায়।

শক কুষাণ হূণ স্কাইথিয়ান প্রভৃতি অনেক বিদেশী জাতি-উপজাতির লোক ভারতে এসেছিল। তারা এখানে রাজ্য স্থাপন করেছিল। তারা কেউ আর ভারত ছেড়ে দেশে ফিরে যায় নি। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে তারা ভারতীয় হয়ে গিয়েছে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদেরও অবদান রয়েছে। এ রকম বিদেশী জাতির বংশধররাই আমাদের বীর রাজপুত জাতির পূর্বপুরুষ।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ঃ মৌর্য যুগের আমলের কথা, সমাজের অবস্থা জানা যায় মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলের কথা লিখে গেছেন ফা-হিয়েন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ মেগাস্থিনিস সেলুকাসের দূত হয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ দরবারে এসেছিলেন। তিনি অনেক দিন ভারতে ছিলেন এবং ভারত সম্পর্কে একখানা বই লিখেছিলেন।

মেগাস্থিনিস তাঁর পুস্তকে ভারতের আবহাওয়া, জমির উর্বরতা, সমাজের লোকজনের জীবনযাত্রা, সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা, পাটলিপুত্র নগরের বিবরণ প্রভৃতি অনেক কথা লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন, নদীবহুল ভারতবর্ষে

প্রচুর বৃষ্টি হয়। জমি উর্বর, শস্য ভাল হয়, দুর্ভিক্ষ হয় না। রাজ্যের লোকেরা ছিল সৎ। চুরিডাকাতির ভয় ছিল না। তবে অন্যায় করলে কঠোর শাস্তি পেতে হত। সম্রাট নিজে বিচার করতেন। যুদ্ধ পরিচালনাও তিনি করতেন। মৌর্য সেনাবাহিনীতে ছয় লক্ষ পদাতিক, তিরিশ হাজার ঘোড়সওয়ার ও ন' হাজার রণহস্তী ছিল।

সমাজে সাত শ্রেণীর মানুষ বাস করত। এরা হল দার্শনিক বা জ্ঞানী, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, সৈন্যদল, গুপ্তচর এবং আমাত্য বা প্রশাসক।

মেগাস্থিনিস বলেছেন, পাটলিপুত্র শহরটি ছিল ন' মাইল (প্রায় সাড়ে চোদ্দ কিলোমিটার) লম্বা ও প্রায় ছ মাইল (সাড়ে ন' কিলোমিটারের বেশি) চওড়া। কাঠের প্রাচীর দিয়ে শহর ঘেরা ছিল। প্রাচীরের বাইরে ছিল জলপূর্ণ গভীর পরিখা। প্রাচীরের চারদিকে মোট পাঁচশ সত্তরটা গম্বুজ ছিল। শহরে প্রবেশ করতে হত প্রকাণ্ড এক তোরণের ভেতর দিয়ে। শহরের রাজপথগুলো ছিল প্রশস্ত। রাজপ্রাসাদটি ছিল শহরের মাঝখানে। অতি মনোরম ছিল প্রাসাদটি। রাজসভায় স্তম্ভগুলো ছিল মহামূল্য মণিমুক্তার কাজ করা।

তিরিশ জন সদস্যের এক সমিতি পাটলিপুত্র শহরের পৌরশাসন চালাত। তিরিশ জনের পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে ছটি উপসমিতি গঠিত হত। উপসমিতির কাজ ছিল জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখা, বাজারের ওজন ও মাপ ঠিক আছে কিনা দেখা, বিদেশীদের দেখাশোনা করা প্রভৃতি।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন দেশ হতে একজন পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম ফা-হিয়েন। তিনি এসেছিলেন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করতে আর বৌদ্ধধর্মের বইপত্র সংগ্রহ করতে। চীন থেকে পায়ে হেঁটে বহু কষ্ট করে তিনি ভারতে এসে পৌঁছন। ফা-হিয়েন তাঁর ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছিলেন। এই বই পড়ে গুপ্তসম্রাটদের আমলের দেশের কথা, সমাজের কথা জানা যায়।

ফা-হিয়েন গুপ্তরাজাদের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ দেশে লোকসংখ্যা ছিল প্রচুর। তারা সুখে ও শান্তিতে বাস করত। লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। রাজকর্মচারীরা খুব দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতি হত না। রাস্তায় সোনা পড়ে থাকিলেও কেউ নিত না। শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর ছিল না, কেবল যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত তাদের ডান হাত কেটে দেওয়া হত। গুরুতর অপরাধ খুব

কমই হত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা মাছ মাংস পেঁয়াজ খেত না। তারা শুয়োর মুরগী পুষত না। মুরগী শুয়োর পুষত চণ্ডালরা। তারা মাছ মাংস পেঁয়াজ খেত। স্বতন্ত্র এলাকায় বাস করত। তখন জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল দেশের লোকেরা অতিথিপরায়ণ ছিল।

দেশের ভেতরে যাতায়াতের কোন বাধা ছিল না। রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল। পথের ধারে পান্থশালা ছিল। ফা-হিয়েন অনেক দিন ধরে তক্ষশীলা মথুরা কনৌজ অযোধ্যা কপিলাবস্তু কাশী পাটলিপুত্র গিয়া রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান ঘুরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন পাটলিপুত্র এক সমৃদ্ধ নগরী। এখানে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। শহরে ছুটি বৌদ্ধ মঠ ছিল। বুদ্ধের মুর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা হত। পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এ প্রাসাদ যেন মানুষের তৈরি নয়।

ফা-হিয়েন সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। ভারতে ভ্রমণ করার সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

ফা-হিয়েন বাংলা দেশেও এসেছিলেন। তিনি তিন বছর তাম্রলিপ্ত শহরে বাস করেছিলেন। এখানে তিনি তখন অনেক বৌদ্ধ মন্দির দেখেছিলেন। তাম্রলিপ্ত হতে জাহাজে করে সিংহল হয়ে ফা-হিয়েন নিজদেশ চীনে ফিরে যান। যাবার সময় সঙ্গে নিয়েছিলেন কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি আর বৌদ্ধধর্মের অনেক পুঁথিপত্র।

প্রাচীন ভারতের শিল্প-শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান: শিল্প এবং স্থাপত্য বিদ্যায় ভারত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই দক্ষ ছিল। মহেঞ্জো-দড়ো এবং হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের ভেতর হতে অতুলনীয় শিল্পসামগ্রী আবিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে যে একাধিক তলার সুউচ্চ বাড়ি ছিল তার প্রমাণও রয়েছে। মৌর্য সম্রাটরা রাজধানী পাটলীপুত্র শহরে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে-ছিলেন। তক্ষশিলার কথা, মথুরার বড় বড় মঠ মন্দিরের কথা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন লিখে গেছেন। গুপ্ত সম্রাটদের আমলের ঘরবাড়ি পরবর্তী মুসলমান আমলে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের তৈরী


মহেঞ্জোদড়োর নর্তকী

গুহামন্দিরগুলি এখনও অটুট আছে। গুপ্ত আমলের চিত্রশিল্পের নমুনা অজন্তার গুহামন্দিরে এখনও অম্লান রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। নাট্যকার ভাস প্রথম শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক স্বপ্নবাসবদত্তা। পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রায় একই সময় রচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের আরও উন্নতি হয় গুপ্ত সম্রাটদের আমলে। এ যুগকে বলা হয় ভারতের স্বুবর্ণ যুগ। কাব্য, নাটক, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতি অনেক বই এই সময় রচিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কোন কোন অংশ গুপ্তযুগে লেখা হয় বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এই যুগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকখানা কাব্যের নাম—রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্। তাঁর অমর নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পৃথিবীর বহুভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। নাটক লিখে নাম করেন আরও দু'জন নাট্যকার। এঁরা হলেন শূদ্রক ও বিশাখ দত্ত। সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ তৈরি করে ছিলেন অমর সিংহ।



মা ও ছেলে (অজন্তা)

শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাচীন ভারতের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। এর একটি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলায়। অপরটি পূর্ব ভারতের বিহারের নালন্দায়। তক্ষশিলায় বিবিধ বিষয় পড়াশোনা করা হত। আয়ুর্বেদগ্রন্থ চরক-সংহিতা প্রণেতা চরক তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। দশ হাজার ছাত্র এখানে বিনা খরচে খাওয়া থাকা পড়াশোনা করতে পারত। বৌদ্ধদর্শন ছাড়া বেদ, দর্শনশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় নালন্দায় পড়ান হত। পাঠ্যবিষয় ছিল দীর্ঘ। পড়া শেষ করতে অনেকদিন লাগত। ভর্তি হওয়া বেশ কষ্টকর ছিল। ভর্তির জন্য আগে পরীক্ষা নেওয়া হত। পাস করলে ভর্তি হওয়ার স্বুযোগ মিলত। এখানকার অধ্যাপকরা জ্ঞানে ও চরিত্রবলে আদর্শ ছিলেন।

বিজ্ঞান চর্চায়ও ভারত পিছিয়ে ছিল না। ধাতুবিদ্যায় ভারত প্রাচীন

কালে কত উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে চন্দ্ররাজার স্তম্ভটি দেখে। দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময় খোলা জায়গায় রোদ বৃষ্টিতে থেকেও তাতে এতটুকু মরচে ধরে নি। অঙ্কশাস্ত্রে দুজন পণ্ডিত ছিলেন জগদ্‌বিখ্যাত। একজন আর্যভট্ট আর একজন ব্রহ্মদত্ত। তাঁরা পাটীগণিত শাস্ত্র প্রবর্তন করেন। আর্যভট্ট জানতেন পৃথিবী ঘুরছে, তাই রাত্রি দিন হয়। চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ লাগার কারণও তিনি জানতেন। ১ থেকে ৯টি সংখ্যা এবং একটি শূন্যের সাহায্যে যে কোন সংখ্যা লেখার তত্ত্ব আর্যভট্ট আর ব্রহ্মদত্ত আবিষ্কার করেছিলেন। সুশ্রুত নামে একজন ঋষি চিকিৎসার বই লিখেছিলেন। তখন অস্ত্রোপচারও করা হত। অস্ত্রোপচারের নানা যন্ত্রপাতির কথাও সুশ্রুত লিখেছেন।

চিকিৎসার নানা ওষুধপত্র তৈরি করার বিবরণ তিনি দিয়ে গেছেন। ওষুধ তৈরি করতে গিয়ে ভারতের চিকিৎসকরা রসায়ন শাস্ত্র আয়ত্ব করেন। গাছ-গাছড়ার পাতা, বাকল, শেকড় সেদ্ধ করে যে রস বা ক্বথ পাওয়া যেত তা হল রস। রস হতে রসায়ন হয়েছে। পরে রসায়ন শাস্ত্র আরও উন্নত করেন নাগার্জুন নামে একজন পণ্ডিত। জ্যোতির্বিদ্যার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বরাহমিহির। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' লিখেছিলেন।

মোটকথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস গড়তে যেমন পণ্ডিতদের অবদান ছিল তেমনি বিশেষ বিশেষ সম্রাট এবং রাজাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অবদানও কম নয়।

অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) আর্যদের সামাজিক, রাজনীতিক ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে যা জান বল।
(খ) গৌতম কি করে বুদ্ধ হলেন ? তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা কর।
(গ) মগধকে কেন্দ্র করে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কে ছিলেন ? ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ণয় কর।
(ঙ) সম্রাট অশোককে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন ?
(চ) গুপ্ত বংশের কোন সম্রাটকে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর ? কেন ?
(ছ) গুপ্ত যুগকে ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) বেদ রচনা করেছিলেন কারা ? পৃথিবীর সব চাইতে পুরানো গ্রন্থখানির নাম কি ? (খ) জৈনধর্ম কে প্রচার করেছিলেন ? তিনি কত বছর বয়সে কোথায় দেহত্যাগ করেন ? (গ) ভারতের প্রথম একরাট্ বা সম্রাটের নাম কি ? তিনি কোন বংশের লোক ছিলেন ? (ঘ) মধ্য

এশিয়ায় ভারত সাম্রাজ্য কে বিস্তার করেছিলেন ? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ? (ঙ) ১ হতে ৯ পর্যন্ত নয়টি সংখ্যা ও একটি শূন্যের সাহায্যে সব রকম রাশি লেখার কৌশল কে আবিষ্কার করেছিলেন ? পাটীগণিত শাস্ত্রে আর কি অবদান তিনি রেখে গেছেন ? (চ) গুহা-মন্দির তৈরির রীতি কোন আমলে আরম্ভ হয়। কোথায় গুহা মন্দির নির্মাণ করা হয়। (ছ) মৌর্য যুগের কথা এবং গুপ্ত যুগের কথা জানা যায় দুজন বিদেশী পর্যটকের বই পড়ে। পর্যটক দুজনের নাম কি ?

৩। টীকা লেখঃ বর্ণাশ্রম, ত্রিপিটক, তীর্থংকর, কলিঙ্গযুদ্ধ, উজ্জয়িনী, বরাহমিহির, আর্যভট্ট, সুশ্রুত, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌, শূদ্রক।

৪। **শূন্যস্থানে উপযুক্ত কথা বসাওঃ**

(ক) তখন ভারতে যে কালো মানুষরা বাস করছিল আর্যরা তাদের নাম দিল —। (খ) শুনে শুনে লেখা হত বলে বেদের আরেক নাম —। (গ) মহাবীর হলেন শেষ —। (ঘ) আশী বছর বয়সে বুদ্ধ — নগরে মহানির্বাণ লাভ করেন। (ঙ) কলিঙ্গ যুদ্ধের পর — নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে অশোক — ধর্মে দীক্ষা নেন। (চ) পাটলিপুত্র এবং — গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুটি রাজধানী ছিল। (ছ) মেগাস্থিনিস বলেছেন পাটলিপুত্র শহরটি ছিল — মাইল লম্বা ও প্রায় — মাইল চওড়া। (জ) — হতে জাহাজে করে সিংহল হয়ে ফা-হিয়েন স্বদেশে ফিরে যান। (ঝ) অঙ্কশাস্ত্রের দুজন পণ্ডিত ছিলেন জগদ্বিখ্যাত, একজন — আর একজন —। (ঞ) জ্যোতির্বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন —।

৫। **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের ঘটনা মেলাওঃ**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(ক) গান্ধার	(১) একজন বিজ্ঞানী ছিলেন
(খ) অজাতশত্রু	(২) অঙ্গদেশ জয় করেন
(গ) আর্যভট্ট	(৩) কোশল রাজ্য আক্রমণ করেন
(ঘ) বিম্বিসার	(৪) একজন রাজা ছিলেন
(ঙ) অঙ্গ	(৫) ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য।

৬। **নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করে লেখঃ**

(ক) জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন বুদ্ধদেব। (খ) বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হয়। (গ) বেদ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (ঘ) আর্যরা এই দেশেরই মানুষ। (ঙ) মেগাস্থিনিস চীন দেশ থেকে ভারতে আসেন। (চ) বৌদ্ধধর্ম পুস্তকে রাঢ় দেশের কথা পাওয়া যায়। (ছ) ইউরোপে অবস্থিত কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

৭। **মৌখিক প্রশ্নঃ**

(১) বেদের অপর নাম কি ও কেন ? (২) বেদাঙ্গ কয়টি ও কি কি ? (৩) আর্যদের জীবনের চারটি আশ্রমের নাম কি ? (৪) কি কারণে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান হয়। (৫) বুদ্ধ নির্দেশিত আটটি নিয়ম কি কি ? (৬) অশোক ভারতের কোথায় কোথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ? (৭) গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর ও কেন ? (৮) ভারতের বাইরে থেকে কোন কোন জাতি উপজাতি প্রাচীনযুগে ভারতে আসে ? (৯) একজন চৈনিক ও একজন গ্রীক ভারত পর্যটকের নাম বল। (১০) অজন্তা ও ইলোরা কি জন্য বিখ্যাত ?